দেশের বর্তমান অবস্থা
এবং
তার পরিণাম

॥ শ্রীহরিঃ ॥

১. দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের অনেক অবনতি হয়েছে। ধর্মের দিক থেকে, আচার-আচরণের দিক থেকে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে, অন্তরের ভাবের দিক থেকে—সব দিক থেকেই অবনতি হয়েছে। আগে ভারতের নানা-প্রকার বিশিষ্ট বিদ্যা ছিল, কলা-কৌশল ছিল, কিন্তু এখন তা সবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এত অবনতি এর আগে আর কখনও হয় নি। দেশপ্রেমীগণ বহু বলিদান দিয়ে ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের এমন অবস্থা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষেরা ইংরেজের রাজ্য-শাসনের প্রশংসা করে থাকে, বলে থাকে যে ইংরেজ-রাজত্বই ভাল ছিল। এ অত্যন্ত লজ্জার কথা।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অপার, কিন্তু এই প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্‌ব্যবহার করা তো দূরের কথা, বরং তা নষ্ট করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই বিনাশকেই উৎপাদন বলে প্রচার করা হচ্ছে! পশু-হত্যাকে বলা হচ্ছে খাদ্য (মাংস) উৎপাদন! গর্ভপাতের মত মহাপাপকে এবং মানুষের উৎপাদক-শক্তির বিনাশকে বলা হয় 'পরিবার-কল্যাণ'। নারীজাতির উচ্ছৃঙ্খলতাকে, মর্যাদার বিনাশকে বলা হয় 'নারী-মুক্তি'! আগে স্ত্রীলোকগণ ঘরের কর্ত্রী (গৃহলক্ষ্মী) হতেন, এখন গৃহের বাইরে বহু পুরুষের দাসত্ব বা চাকরী করাকে বলা হয় 'নারী-স্বাধীনতা'! এই ভাবে পরাধীনতাকে স্বাধীনতা বলে মনে করা হয়! নৈতিক অবনতিকে উন্নতির সংজ্ঞার্থ দেওয়া হচ্ছে! পশুত্বকে সভ্যতার চিহ্ন বলে ধরা হচ্ছে! ধার্মিকতাকে বলা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মবিরুদ্ধতাকে বলা হচ্ছে ধর্ম-নিরপেক্ষতা! বুদ্ধির বলিহারী! **'বিনাশকালে বিপরীত-বুদ্ধিঃ'**। গীতায় একে তামসী বুদ্ধি বলা হয়েছে—

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।

(গীতা ১৮/৩২)

।। শ্রীহরিঃ ।।

সূচীপত্র

'হে পার্থ! তমোগুণে আচ্ছন্ন যে-বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সকল বিষয়কেই বিপরীত বলে মনে করে, তাকে তামসিক বুদ্ধি বলা হয়।'

মন্দোদরী রাবণকে বলেছেন—

কাল দণ্ড গহি কাহু না মারা। হরই ধর্ম বল বুদ্ধি বিচারা॥
নিকট কাল জেহি আবত সাইঁ। তেহি ভ্রম হোই তুম্‌হারিহি নাইঁ॥

(মানস, লঙ্কাকাণ্ড, ৩৭/৪)

ঈশ্বর এবং প্রকৃতির বিধানের তিরস্কার

ঈশ্বর এবং প্রকৃতির বিধান অনুসারে জগৎ-সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু হয়ে চলেছে। এই জন্ম-মরণরূপ কার্য মানুষের হাতে নেই, তা ঈশ্বর ও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে। কোনো জীবকে হত্যা করা যেমন মানুষের অধিকার বহির্ভূত কাজ, তেমনই কোনো জীবের জন্ম রোধ করাও মানুষের অধিকার বহির্ভূত, একটি ভয়ানক পাপকর্ম। তাৎপর্য হল এই যে, ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিধান অনুসারে জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণ বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অনাদিকাল হতে স্বাভাবিকভাবে হয়ে আসছে। যেমন, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি জন্তুগুলির বহু বাচ্চা জন্মায় এবং তারা পরিবার-নিয়োজন করে না, তবুও সেগুলির দ্বারা যে পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে, তা দেখা যায় না, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর এবং প্রকৃতির বিধানেই তাদের নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। তাঁর বিধানে হস্তক্ষেপ করা, কর্তৃত্ব করা, অন্যায়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, পারসী এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী অন্যান্য ধর্ম যেমন জৈন, শিখ, আর্য- সমাজী প্রভৃতি যাই হোক না কেন, কৃত্রিম ভাবে যাঁরা সন্তান-জন্ম রোধ করেন, তাঁরা ধর্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, ঈশ্বরবিরুদ্ধ, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করে থাকেন, যার জন্য ইহলোকে ও পরলোকে তাদের ভীষণ শাস্তি পেতে হয়।

একজন অত্যন্ত দয়ালু এবং পরোপকারী সাধু ছিলেন। তাঁকে ভগবান একবার দর্শন দিয়ে বর দিতে চাইলে সাধু বললেন যে, 'আমি
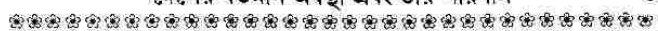
যেখানেই যাই, সেখানেই লোকে বলে যে মহারাজ, কৃপা করো যেন বর্ষা এসে যায়। সুতরাং আপনি এমন বর প্রদান করুন যেন আমি যেখানেই বলব, সেখানেই যেন বৃষ্টি হয়।' ভগবান সেই বরই দান করলেন। এবার বাবাজী নানা স্থানে খুব বৃষ্টিপাত করাতে থাকলেন। বেশী বৃষ্টি হওয়ায় বিষাক্ত জীব-জন্তু জন্মাতে লাগল, যার ফলে ক্ষেত নষ্ট হতে থাকল। বিষাক্ত গাছ উৎপন্ন হল। পশুরা রোগগ্রস্ত হল। জ্বর-জারি হতে থাকল এবং তাতে সব মরতে আরম্ভ করলো। বাবাজী তখন ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। ভগবান বললেন, বর্ষার পর কিছুদিন সূর্য তাপ প্রদান করলে জলবায়ু পরিশুদ্ধ হয়, কিন্তু একনাগাড়ে বৃষ্টি হলে আবহাওয়া বিষাক্ত হয়। অতএব তোমার ইচ্ছানুযায়ী বৃষ্টি হওয়াতেই এই অবস্থা হয়েছে। তখন বাবাজী ভগবানকে বললেন, তাহলে এবার এই ব্যাপার আপনিই সামলান, কারণ কখন, কোথায় কী বস্তু প্রয়োজন তা আপনিই যথার্থ জানেন—

মেরী চাহী মৎ করো, ম্যাঁয় মূরখ অজ্ঞান। তেরী চাহী মেঁপ্রভো, হ্যায় মেরা কল্যাণ।।

এর অর্থ হল যে ভগবান এবং প্রকৃতির বিধানে যা কিছু হয়, তাই ঠিক; কারণ তাঁর দূরদৃষ্টি আছে আর মানুষতো অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট। যখন পরহিতার্থে ভগবান এবং প্রকৃতির কাজ নিজহাতে নিলেও ক্ষতি হয়, তাহলে যাদের পরহিতের কোন ব্যাপার নেই, বরং স্বার্থ-ভাব থাকে, তাদের পক্ষে ভগবানের ও প্রকৃতির কাজ নিজ হাতে নিলে না জানি কত ক্ষতি হবে!

ঈশ্বর এবং প্রকৃতি-প্রদত্ত উৎপাদক-শক্তি নষ্ট করা মহা বিনাশকারক। সমস্ত জন্মের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্মের উৎপাদকশক্তির বিনাশ করলে উন্নতি হবে কী প্রকারে? পরিণামে পতনই হয়ে থাকে। মনুষ্যজাতির মধ্যেও হিন্দু সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এতে অত্যন্ত বিশিষ্ট ঋষি-মুনি, সাধু-মহাত্মা, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক, বিচারক-আইনজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেছেন। এই জাতিতে মানুষের জন্ম যদি না নিতে দেওয়া হয়, তাহলে এরূপ শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট ব্যক্তি

কীভাবে ও কোথায় জন্ম নেবেন?

চিন্তা করে দেখতে হয় যে, একদিকে আমরা দেশের উন্নতির জন্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চাইছি, অন্যদিকে উৎপাদক-শক্তিকে রুদ্ধ করে রাখছি! উৎপাদকই যদি না থাকে, তাহলে উৎপাদন হবে কী করে? ভোজনাগারে লোক বেশী হলে যেমন আমাদের কাজ হয় বেশী রান্না করা, লোকেদের আসা বন্ধ করা নয়; তেমনই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, বুদ্ধিমত্তার কাজ হল উৎপাদন বাড়ানো, মানুষের জন্ম-রোধ করা নয়। এখন ক্ষেতে কাজ করার লোকের অভাব হচ্ছে। এক বা দুটি সন্তান হলে ঘরের কাজই সম্পূর্ণভাবে করা হয় না, তাহলে চাষ করবে কে? বৃদ্ধ মা-বাপের সেবা কে করবে? সমাজের দেখা-শোনা কে করবে? সেনাদলে যোগ দেবে কে? কলাকৌশল কে-ই বা শিখবে আর কে শেখাবে? বৈজ্ঞানিক কে হবে? কে কলকারখানায় কাজ করবে? নতুন নতুন আবিষ্কার কে করবে? শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কী করে হবে? পরিণামে কী দশা হবে—এই সব ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না। জন্ম হলে মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেরূপ অবশ্যম্ভাবী আর কিছুই নয়। বালক জন্মালে বড় হবে কি হবে না, পড়বে কি পড়বে না; ব্যবসা বা চাকুরী করবে কি করবে না; ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে কি হবে না, বিবাহ করবে কি করবে না, তার সন্তান হবে কি হবে না— এই সমস্ত বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু সে মরবে কি মরবে না, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। কারণ সে অবশ্যই মরবে। এই ভাবে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পথ সবসময় খোলা রয়েছে। এমন কোন বছর, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট বা সেকেণ্ড নেই, যে সময়ে মানুষ মরে না। বালকও মরে, যুবকও মরে আবার বৃদ্ধও মরে। রোগীও মরে আবার নীরোগ ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়। আমি শুনেছি যে কোন এক গ্রামে এক ব্যক্তির দুটি ছেলে ছিল। তারা দুজনেই মারা গেছে আর এখন বৃদ্ধ বাপ-

মাকে জল দেবারও কেউ নেই! একজনের ছয়-সাতটি ছেলে ছিল, তার মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই মারা গেছে! চিন্তার বিষয় হল এই যে, যে ব্যক্তি একটি-দুটি সন্তানের জন্মের পর অপারেশান (লাইগেট) ইত্যাদি করিয়ে নিয়েছে, প্রারব্ধবশত যদি তার সন্তান জীবিত না থাকে, তাহলে তার কী অবস্থা হবে?

প্রশ্ন—জাপান, ইজ্‌রাইল, ব্রিটেন ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলির জনসংখ্যা কম হলেও এরা অত্যন্ত উন্নত আর ভারতের জনসংখ্যা বেশী হলেও বেকারী, গরিবী ইত্যাদির জন্য পিছিয়ে আছে। সুতরাং ভারতের উন্নতির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নেই, বরং জনসংখ্যা কম করাই প্রয়োজন। কারণ একটি সিংহ একপাল মেষের থেকে শ্রেষ্ঠ।

সমাধান—আমি জনসংখ্যা বাড়াবারও পক্ষপাতী নই বা জনসংখ্যা কমাবারও পক্ষপাতী নই, কিন্তু জনতার হিত কিসে হয়—আমি তারই পক্ষপাতী। জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার ইচ্ছাও মূর্খতা আর কমাবার ইচ্ছা হল মহামূর্খতা; কারণ এটি মানুষের অধিকার বহির্ভূত কাজ, এ কাজ হল ঈশ্বর ও প্রকৃতির অধিকারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের পক্ষে হানিকারক নয়, বরং কৃত্রিম উপায়ে সন্তান জন্ম-রোধ করার চেষ্টা মহাহানিকারক। কারণ এর প্রচার এবং প্রসারের সাহায্যে সমাজে প্রত্যক্ষভাবে ব্যভিচার, ভোগপরায়ণতা ইত্যাদি দোষ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং চরিত্র, শীল, সংযম, লজ্জা ইত্যাদি গুণাবলী হ্রাস পাচ্ছে। লোকের চরিত্রে যদি শীল, সংযম ইত্যাদি না থাকে, তাহলে দেশ শক্তিশালী হবে কী ভাবে? ইংরেজীতে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে—

If money is lost nothing is lost,

If health is lost something is lost,

If character is lost everything is lost.

জাপান ইত্যাদি দেশগুলিতে যে-উন্নতি দেখা যায়, তা জনসংখ্যা কমের জন্য নয়, তাহল ওখানকার লোকেদের কর্তব্যপরায়ণতা,

বিশ্বাসযোগ্যতা, পরিশ্রম, দেশভক্তি ইত্যাদির জন্য *। আমাদের দেশের পিছিয়ে-পড়ার (বেকারী ও গরিবীর) কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, প্রকৃত কারণ হল অকর্মণ্যতা, চরিত্রহীনতা, আলস্য, প্রমাদ, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদির বৃদ্ধি। কিন্তু আমরা কর্মপ্রচেষ্টা, চারিত্র্য, সংযম, ত্যাগ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য না দিয়ে জনসংখ্যা কম করার উপায়ের দিকেই নজর দিয়ে থাকি, যা দুরাচারের বৃদ্ধিকারী। এটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। উদাহরণ স্বরূপ ঃ সিনেমা, ভিডিও, পত্র-পত্রিকার দ্বারা সাধারণ মানুষের চরিত্র, মর্যাদা ভ্রষ্ট করা হচ্ছে, তাদের ব্যভিচার, হিংসা, চুরি প্রভৃতির শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। নানাস্থানে মদের দোকান খুলে, পান-মশলা ইত্যাদি বস্তুর প্রচার করে লোকেদের নেশাগ্রস্ত করা হচ্ছে এবং তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করা হচ্ছে। বিভিন্নভাবে লোকেদের কাজ কম করার ও বেশী খরচ করে আয়েস-আরামের প্রেরণা দেওয়া হচ্ছে; যেমন— সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ করবে, অমুক সময়ে দোকান খুলবে না, ইত্যাদি। কর্মচারীরা কাজ করুক বা না করুক তাদের সম্পূর্ণ বেতন দেওয়া হয়, তাহলে তারা আর বেশী কাজ করে পরিশ্রম কেন করবে? তারা তাস খেলা, চা পান বা ধূমপান ইত্যাদি বৃথা কাজে নিজেদের সময় নষ্ট করে থাকে। সরকারী অফিসে ঘুষ ছাড়া প্রায়ই কোন কাজ সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক জায়গাতেই ভ্রষ্টাচার ছড়িয়ে পড়ছে। রক্ষকই ভক্ষক হয়ে উঠছে। যে পদের অনুযায়ী যে ব্যক্তি কাজ করতে পারে না, তাকে সেই পদে শুধুমাত্র জাতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, যোগ্য ব্যক্তি চাকরী পায় না। স্কুলে শিশুদের ভর্তি করতে হাজার হাজার টাকা 'ডোনেশনে'র নামে ঘুষ দেওয়া হয়। শিক্ষকগণ স্কুলে ছাত্রদের ঠিক

---

* বিদেশে যে কর্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদি গুণ দেখা যায়, তা ধর্ম ও ঈশ্বরমুখী নয়, এগুলি ব্যাবহারিক সুবিধার জন্য, যাতে ব্যবস্থা ঠিক মতো বজায় থাকে। কিন্তু এই গুণ বেশিদিন বজায় থাকবে না; কারণ সদ্‌গুণ ও সদাচারের মূল হলো ধর্ম ও ঈশ্বর; এঁদের ছাড়া সদ্ গুণ ও সদাচার কখনো স্থায়ী হতে পারে না— **'মূলাভাবে কুতঃ শাখা'** মূল ছাড়া শাখা কোথায়?'

মতো পড়ান না, আর কেবল প্রাইভেট টিউশনির জন্য প্ররোচিত করে থাকেন।

দেশী বাজ্‌রার এক একটি গাছ থেকে এক-দেড়শো শস্যের শীষ জন্মায়। আমি একটি গাছ থেকে তিনশো শীষ উৎপন্ন হওয়ার কথাও শুনেছি। কিন্তু গভর্নমেণ্ট কৃষকদের দেশী শস্য না দিয়ে বিদেশী শস্যের বীজ দিচ্ছেন, যার গাছ থেকে শুধুমাত্র একটি শীষই উৎপন্ন হয়! এ কেমন বুদ্ধির কথা তা বোঝা যায় না!

সেই রাজ্যই সুরাজ্য, যেখানে প্রজারা ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং যেখানে কোন শত্রুতা নেই—'অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যম্' (গীতা ২/৮)। কিন্তু আজকাল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দ্বেষ উৎপন্ন করিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উভয়ে একে অপরের প্রাণ ও সম্পত্তি নষ্ট করছে। এর পরিণামে দেশের জনগণ এবং সম্পত্তিই নষ্ট হচ্ছে। যে-দেশের জনগণ ও সম্পত্তি নাশ হয়, সেই দেশ সুখী, সমৃদ্ধ এবং ধনী কি করে হবে? সেই দেশে সুখ-শান্তি কী করে আসবে?

এইরূপ নানা কারণে দেশের অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। এই অবস্থায় জনসংখ্যা কম করলে কি বেকারি এবং গরিবী দূর হবে? দূর তো হবেই না, বরং দেশ বলহীন এবং পরাধীন হয়ে পড়বে।

জনসংখ্যা কম হলেই সকলে সিংহের মত শক্তিশালী হয়ে উঠবে না। সিংহের ব্রহ্মচর্য শক্তি থাকে, কিন্তু সন্তান-নিরোধের দ্বারা ব্রহ্মচর্য নাশ হচ্ছে; কারণ কৃত্রিমভাবে সন্তান-নিরোধের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হলো ভোগ-বিলাস করব, ব্রহ্মচর্য নষ্ট করব, কিন্তু সন্তান উৎপন্ন যেন না হয়! সন্তান-জন্ম যদি রোধ করতেই হয়, তাহলে ব্রহ্মচর্য পালন করা উচিত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যদিও আমার উদ্দেশ্য নয়, তা সত্ত্বেও যদি কেউ মনে করেন যে আমি জনসংখ্যা বাড়াবার কথাই বলছি, তবুও তা অনুচিত নয়, কারণ শাস্ত্রাদিতে (ব্রহ্মার) জনসংখ্যা বৃদ্ধির নির্দেশ আছে,

কিন্তু কমাবার নির্দেশ কোথাও নেই! দ্বিতীয়ত, আজকাল ভোটের যুগ। সিংহ যদিও মেষের থেকে শ্রেষ্ঠ ও বলবান, কিন্তু ভোটের সংখ্যা কম হলে সিংহ হেরে যাবে আর মেষেরাই রাজ্যলাভ করবে!

সন্তান-রোধ করার কৃত্রিম উপায়ের প্রচারে নারী ও পুরুষ—উভয়েই এত ক্রূর, নির্দয় ও হিংস্র হয়ে যায় যে গর্ভস্থ নিজ সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা (ভ্রূণ হত্যা) করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, যা ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ *। নিজ গর্ভ নষ্টকারী নারী সর্পিণীর ন্যায়, যে নিজ সন্তানকেও শেষ করে দেয়। গাভী অত্যন্ত সৌম্য স্বভাবযুক্ত হয়, কিন্তু সে-ও তার সন্তানের কাছে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না। মেষ পালকগণ বলে যে মেষ কোন কোন বাচ্চা পরিত্যাগ করে, কিন্তু যদি কুকুর সেই পরিত্যক্ত বাচ্চাটিকে আক্রমণ করে তাহলে মেষ সেই বাচ্চাটিকে আবার গ্রহণ করে এবং তাকে রক্ষা করে। কিন্তু আজকালকার নারীরা গাভীর মতো হওয়া তো দূরের কথা, মূর্খ বলে খ্যাত মেষের মতোও নয়, তারা মহাবিষাক্ত সর্পিণীর ন্যায় ব্যবহার করছে। কোথায় বলা হয়ে থাকে যে মায়ের মতো করে পালন-পোষণ আর কেউ করতে পারে না—**'মাত্রা সমং নাস্তি শরীরপোষণম্'** আর কোথায় আজকালকার নারীদের নিজ সন্তানপালনই কষ্টকর বলে মনে হয়। এ কত না নৈতিক পতনের কথা!

প্রশ্ন—বিদেশে প্রায়শই লোকের চারিত্রিক অধ:পতন হচ্ছে, সেখানে ব্যভিচার, হিংসা ইত্যাদি পাপও বেশী হয়ে থাকে, তাহলেও তাদের দেশ কেন এত উন্নত?

---

* **যৎপাপং ব্রহ্মহত্যায়াং দ্বিগুণ গর্ভপাতনে।**
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি তস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে ॥ (পারাশরস্মৃতি, ৪/২০)

'ব্রহ্মহত্যায় যে পাপ হয়, গর্ভপাত করলে তার দ্বিগুণ পাপ হয়। এই গর্ভপাতরূপ মহাপাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই, এর বিধান হল ঐ স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করা।'

সমাধান—সেগুলি পার্থিব উন্নতি। পার্থিব উন্নতি প্রকৃতপক্ষে কোন উন্নতিই নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিই হল প্রকৃত উন্নতি। যাঁদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নেই, শুধু পার্থিব দিকে দৃষ্টি থাকে, তাদের কাছেই পার্থিব উন্নতি বেশী বলে মনে হয়। বিদেশে পার্থিব উন্নতি হলেও লোকে অন্তরে দুঃখ, অশান্তি, অসন্তোষে জ্বলে যায়, যার ফলে ওদেশে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। পার্থিব উন্নতির পরিণাম হল বিনাশ। আমাদের দেশে পুরাকালে রাক্ষসেরা খুব উন্নতি করেছিল, কিন্তু তারা অন্যকেও ধ্বংস করছে আর নিজেরাও ধ্বংস হয়ে গেছে। রাবণও খুব পার্থিব উন্নতি করেছিল, কিন্তু পরিণামে তার ও প্রজাদের পার্থিব উন্নতির বিনাশই হয়েছিল। এমন দশা হয়েছিল যে তাদের জন্য শোক করারও কেউ ছিল না।

মহাভারতে (বনপর্ব, ৯৭তম অধ্যায়ে) একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা একবার সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার পাবার ইচ্ছা করেছিলেন। অর্থলাভের আশায় অগস্ত্য ক্রমশ শ্রুতর্বা, ব্রধ্নশ্ব এবং ত্রসদস্যু—এই তিন রাজার কাছে গেলেন। কিন্তু তিন রাজার আয়ব্যয়ের হিসাব নিয়ে তিনি যখন বুঝলেন যে, এর থেকে অর্থ গ্রহণ করলে প্রাণীদের কষ্ট হবে, তখন অগস্ত্য রাজাদের থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারলেন না। তখন সেই রাজারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন যে ইল্বল নামক রাক্ষসের কাছে বহু অর্থ সঞ্চিত রয়েছে। তাই অর্থ পেতে গেলে তার কাছে যেতে হবে। তখন সেই তিন রাজা মহর্ষি অগস্ত্যের সঙ্গে ইল্বলের কাছে গেলেন। সেখানে তারা অনেক অর্থ পেলেন। এর অর্থ হল যে প্রয়োজনের অধিক অর্থ যক্ষ-রাক্ষসগণের কাছেই থাকত, রাজাদের কাছে নয়। তাই যারা কেবল অর্থ সংগ্রহ করে এবং অর্থেরই রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাদের বলা হয় যক্ষবিত্ত। যক্ষবিত্তের পতন হয়—**'যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ'** (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১/২৩/২৪)।

মাতৃশক্তির তিরস্কার

বর্তমানে নারী-জাতির তিরস্কার, ঘোর অপমান করা হচ্ছে। নারীর মহৎ মাতৃরূপ নষ্ট করে তাদের ভোগ্যা নারীর রূপ দেওয়া হচ্ছে। ভোগ্যা নারী বেশ্যারই অপর নাম। যত শ্রদ্ধা মায়ের (মাতৃশক্তির) থাকে, ততো শ্রদ্ধা (ভোগ্যা) নারীর থাকে না। কিন্তু যারা স্ত্রীলোকদের ভোগ্যা বলে মনে করে, স্ত্রীলোকের গোলাম হয়, সেই ভোগী ব্যক্তিরা এই কথার কি বুঝবে? বোঝা সম্ভবই নয়। মা হবার জন্যই বিবাহ করা হয়, ভোগ্যা হবার জন্য নয়। সন্তান উৎপাদনের জন্যই বরপক্ষ কন্যাদান স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু এখন নারীদের মা হতে দেওয়া হয় না, তাদের শুধু ভোগ্যা তৈরী করা হয়। নারীজাতির কি মহা অপমান!

নারী প্রকৃতপক্ষে মাতৃশক্তি। নারী ও পুরুষ—উভয়েরই জননী এই নারী। শুধু পুরুষেরই সে পত্নী হয়, কিন্তু মা হয় নারী ও পুরুষ উভয়েরই। পুরুষ যদি ভালো হয় তাহলে শুধুমাত্র তার নিজের কুলেরই মহিমা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নারী ভালো হলে তার পিতৃকুল ও শ্বশ্রূকুল—উভয়েই মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাজর্ষি জনক সীতাকে বলেছিলেন—**'পুত্রি পবিত্র কিয়ে কুল দোউ'**, (হে পুত্রী, তুমি দুইকুলই পবিত্র করেছ।) (মানস, অযোধ্যাকাণ্ড, ২৮৭/১)।

আজকাল বিবাহের সময় কন্যার স্বভাব, সহিষ্ণুতা, আস্তিক্য ভাব, ধার্মিকতা, কার্য-কুশলতা ইত্যাদি গুণ না দেখে শুধু তার শারীরিক সৌন্দর্য দেখা হয়। পরিণামের দিকে দৃষ্টি না রেখে তাৎকালিক ভোগের দৃষ্টিতে কন্যাকে পরীক্ষা করা হয়। বিচার করে দেখা হয় না যে সুন্দর স্বভার সর্বদা থাকবে, কিন্তু সৌন্দর্য থাকবে কদিন? *ভোগী ব্যক্তিরা যদি জগতের

---

* দ্রৌপদী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন বলেই জয়দ্রথ, কীচকএবং অষ্টাদশঅক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস হয়েছিল। তাই বলা হয়—

ঋণকর্তা পিতা শত্রুঃ মাতা ব্যভিচারিণী।
ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ।। (চাণক্যনীতি ৬/১০)

'ঋণকারী পিতা, ব্যভিচারিণী মাতা, সুন্দরী পত্নী এবং মূর্খ পুত্র এই—চারটি শত্রুর ন্যায় (দুঃখ প্রদানকারী)।'

সমস্ত স্ত্রীলোকও প্রাপ্ত হয়, তাহলেও তাদের সন্তুষ্টি সম্ভব নয়—

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিয়বং হিরণ্যং পশবং স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে।।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৯/১৯/১৩)

'যে ব্যক্তি কামনায় জর্জরিত, সে যদি পৃথিবীর সমস্ত ধনধান্য, স্বর্ণ, পশুধন এবং নারীও লাভ করে, তাহলেও সে তাতে সন্তুষ্ট হয় না।'

এরূপ ভোগী ব্যক্তিগণই গর্ভনিরোধক যাবতীয় বস্তু ব্যবহার করে মহাপাপ করে থাকে। বংশবৃদ্ধির জন্যই বিবাহ করা। কন্যা যদি সদ্‌গুণ ও সদাচার-সম্পন্ন হয় তবে বিবাহের পর তার যে সন্তান হয় সে-ও সেইরূপ সদ্‌গুণও সদাচার সম্পন্ন হয়, কারণ প্রায়শ মায়ের স্বভাবই সন্তানে বর্তায়। একটি প্রবাদ আছেঃ **'নর নানানে জায়ে হ্যায়'** অর্থাৎ মানুষের স্বভাব তার মায়ের পিতৃকুলের মত হয়। **'মাঁ পর পূতা পিতা পর ঘোড়া। বহুৎ নহী তো থোড়া থোড়া'**।

কন্যাদানেও নারী-জাতির সম্মান, অপমান নয়। এটি অন্যদানের মত ব্যাপার নয়। অন্যদানে দান করা জিনিসের ওপর দাতার কোন অধিকার থাকে না, কিন্তু কন্যা তার সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরে মা-বাবার সেই কন্যার ওপর অধিকার ফিরে আসে এবং প্রয়োজন হলে তখন অন্নগ্রহণও করতে পারে। কারণ কন্যার স্বামী পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্যই বিবাহ করে এবং তার দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হলেই সে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়। সেইজন্য অন্য গোত্র হলেও দৌহিত্র তার মায়ের বাবা এবং মায়ের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে থাকে, এটি লোকাচার এবং শাস্ত্রাচারেও আছে।

আমাদের শাস্ত্রে নারীজাতির অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মান করা হয়েছে। নারী জাতির রক্ষার জন্য শাস্ত্রে তাদের পিতা, পতি অথবা পুত্রের আশ্রয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে সে নানাস্থানে ধাক্কা খেয়ে না ফেরে

বা বেশ্যা না হয়ে যায়*.। নারীর চাকরী করা তাদের পক্ষে অপমান। তাদের ঘরে থাকাই মহিমা। ঘরে থাকলে নারী মহারানী, বাইরে গেলে চাকরানী। ঘরে সে একজন পুরুষের অধীনে থাকে, আর বাইরে তাকে অনেক নারী-পুরুষের অধীনে থাকতে হয়; উচ্চ পদাধিকারী অফিসারের অধীনতা, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়, যা তার কোমল হৃদয় স্বভাবের বিরুদ্ধ। তারা সম্মানের যোগ্য, নিন্দা-তিরস্কাররের নয়। পিতা, পতি বা পুত্রের অধীনতা আসলে স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে না, বরং প্রকৃতঅর্থে স্বাধীন করে তোলে। গৃহে বৃদ্ধা 'মা'য়ের সব থেকে বেশী সম্মান হয়ে থাকে, ছেলে-নাতি সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে থাকে, কিন্তু গৃহের বাইরে বৃদ্ধস্ত্রীলোককে সকলেই লাঞ্ছিত করে।

নারীরা বাইরের কাজ ঠিকমতো করতে পারে না আর পুরুষেরা গৃহের কাজ ঠিকভাবে করতে সক্ষম হয় না। নারীরা চাকরী করতে গেলেও সেখানে সোয়েটার বোনে—ঘরের কাজ করে। পুরুষরা মিছেই বড়াই করে যে নারীরা ঘরে কি কাজ করে? কাজ তো আমরা করি, পয়সা রোজগার করি! যদি পুরুষ গৃহে একদিনও রান্নার কাজ করে এবং বাচ্চাদের রাখে, তাহলে তারা বুঝতে পারে নারীরা ঘরে কি কাজ করে! যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয় তাহলে বাচ্চাদের শাশুড়ী, দিদিমা বা পিসীমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, কারণ পুরুষেরা তাদের পালন করতে পারে না। কিন্তু স্বামীর যদি মৃত্যু হয় তাহলে স্ত্রী কষ্ট সহ্য করেও বাচ্চাদের পালন করে এবং লেখাপড়া শিখিয়ে যোগ্য করে তোলে। কারণ স্ত্রীলোক মাতৃশক্তি, তাদের পালন করার যোগ্যতা থাকে। আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখেছি। মেয়েরা কোন জিনিস পেলে তা তাদের ছোট ভাই-বোনের

---

* ভ্রমন্ সংপূজ্যতে রাজা ভ্রমন্‌সংপূজ্যতে দ্বিজঃ।
ভ্রমন্ সংপূজ্যতে যোগী ভ্রমন্তী স্ত্রী বিনশ্যতি।। (চাণক্যনীতি ৬/৪)

'ভ্রমণ করলে রাজা পূজিত হন, ভ্রমণ করলে ব্রাহ্মণ পূজিত হন, ভ্রমণ করলে যোগী পূজিত হন, কিন্তু স্ত্রীলোক ভ্রমণ করলে অর্থাৎ একা-একা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ালে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তার পতন হয়।'

জন্য রেখে দেয়, কিন্তু ছেলেরা তৎক্ষণাৎ নিজে সেটি খেয়ে নেয়। কোন সাধু, দরিদ্রলোক বা ক্ষুধার্ত বসে থাকলে বহু পুরুষ তার কাছ দিয়ে চলে গেলেও, তাদের মনে এদের কিছু খেতে দেবার কথা চিন্তায় আসে না। কিন্তু নারীরা জিজ্ঞাসা করবে, 'বাবাজী, কিছু খাবেন!' কারণ তাদের মনে দয়া থাকে। তাদের সন্তান পালন-পোষণ করতে হয়, তাই ভগবান তাদের হৃদয়ে এমন দয়া দিয়েছেন।

আজকাল নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু শাস্ত্রাদিতে মায়ের রূপে নারীদের পুরুষের থেকেও বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে —

সহস্রং তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে।। (মনু, ২/১৪৫)

'মায়ের স্থান পিতার থেকে হাজার গুণ বেশী বলে মানা হয়।'

সর্ববন্দ্যেন যতিনা প্রসূর্বন্দ্যা প্রযত্নতঃ।। (স্কন্দপুরাণ, কাশী, ১১/৫০)

'সবার বন্দনীয় সন্ন্যাসীরও মাকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে বন্দনা করা উচিত'।

আজকাল গর্ভ-পরীক্ষা করে দেখা হয়, যদি গর্ভে কন্যাসন্তান থাকে তবে তা নষ্ট করে ফেলা হয়, এই কি নারীজাতিকে সমান অধিকার প্রদান করা?

'মা' কথাটির উচ্চারণে যে-ভাব উৎপন্ন হয়, 'স্ত্রী' কথাটিতে সেই ভাব উৎপন্ন হয় না। তাই শ্রীশঙ্করাচার্যও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'মা' বলে সম্বোধন করছেন —**'মাতঃ কৃষ্ণাভিধানে'** (প্রবোধ, ২৪৪) উপনিষদে **'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'** বলে সর্বপ্রথম মায়ের বন্দনা করা হয়েছে। **'বন্দে মাতরম্'** বাক্যেও মাকে বন্দনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্মে মাতৃশক্তির উপাসনার বিশেষ মহত্ত্ব আছে। ঈশ্বররূপ পঞ্চদেবতার মধ্যেও মাতৃশক্তির (ভগবতীর) স্থান আছে। দেবীভাগবৎ, দুর্গাসপ্তসতী ইত্যাদি বহুগ্রন্থ মাতৃশক্তির ওপরই আধারিত। জগতের সকল নারীকেই মাতৃশক্তির রূপ বলে মানা হয় —

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। (দুর্গাসপ্তসতী, ১১/৫)

কিন্তু ভোগীরা মাতৃশক্তির কি বুঝবে? তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভবই নয়। তারা এদের শুধু ভোগ্যা বলে মনে করে।

শাস্ত্রে যে নারীদের পুনর্বিবাহ না করে বিধবা-ধর্ম পালনের কথা বলা হয়েছে, তা তাদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্যেই, অপমানের জন্য নয়। তিতিক্ষু ও তপস্বী ব্যক্তিরা সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত হয়ে থাকেন। পুরুষেরা স্ত্রীলোককে তিরস্কার করবে, তাকে দুঃখ দেবে, তাকে ত্যাগ করবে, মারধোর করবে —শাস্ত্রে কোথাও এমন কথা বলা হয়নি। শুধু তাই নয়, স্ত্রীলোকের দ্বারা যদি কোন গুরুতর অপরাধও করা হয়ে থাকে, তাহলেও তাকে মার-ধোর করার কোন বিধান নেই, বরং তারা ক্ষমারই যোগ্য।

ভীষ্ম কৌরবসেনাদের রক্ষাকর্তা ছিলেন—'**অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্**' (গীতা, ১/১০), কিন্তু দুর্যোধন তাঁকে রক্ষার জন্যেও নিজ সেনাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন — '**ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি**' (গীতা, ১/১১) কারণ দুর্যোধন জানতেন যে শিখণ্ডীকে ভীষ্ম কখনও অস্ত্রাঘাত করবেন না, তাতে যদি ভীষ্মের মৃত্যুও হয়, তবুও নয়।! শিখণ্ডী আগের জন্মে নারী ছিলেন, এখন নয়, কিন্তু এজন্মে পুরুষরূপে থাকলেও ভীষ্ম তাঁকে নারী বলেই মনে করতেন, তাই তাঁর ওপর অস্ত্রাঘাত করেন নি, তার জন্য তিনি মৃত্যুকে স্বীকার করেছেন—নারীজাতির কী সম্মান!

কিছুকাল আগের কথা, একবার যোধপুরে রাজা স্যর উম্মেদসিংজী এবং বীকানীরের রাজা স্যর শার্দূলসিংজী শিকার করতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। সেখানে শার্দুলসিংজীর গুলিতে পায়ে চোট পেয়ে এক সিংহী আহত হয়। আহত সিংহী গর্জন করে তাঁদের দিকে তেড়ে এলে উম্মেদসিংজী বললেন—'হীরা! একি করেছ? এ তো মাদী!' জেনে যাবার পর তিনি

সেই সিংহীকে গুলি করেন নি, বরং তার আক্রমণ থেকে কোনক্রমে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। নারীজাতির কত সম্মান!

শাস্ত্রাদিতে পুরুষদের জন্যে সন্ধ্যা উপাসনা, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, বেদপাঠ ইত্যাদি নানাপ্রকার কর্তব্য কর্ম করার কথা আছে, কিন্তু নারীদের ঐ সব কর্তব্য কর্ম, পিতৃঋণ ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে * এবং তাদের পতির পুণ্যের অর্ধেক শারীর বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্র যাঁরা জানেন না তাঁরা এবিষয়ে কি বুঝবে? আজকাল নারীদের নিজ কর্তব্য থেকে বিমুখ করে নানা ঝামেলায় ফেলা হচ্ছে। শাস্ত্র কেবল পুরুষকেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করে সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আজকাল নারীদের যজ্ঞোপবীত প্রদান করে তাদের উল্টে ঝামেলায় ফেলা হচ্ছে! একি কোন বুদ্ধিমত্তার কাজ? পতির পুণ্যকর্মের ভাগ তো পত্নী পায়ই কিন্তু পাপের ভাগীদার হয় না, পত্নী শুধু পুণ্যের অর্ধেক ভাগ লাভ করে। সমাজেও এরূপ দেখা যায় যে ডাক্তার, পণ্ডিত এঁদের স্ত্রী মূর্খ হলেও তাঁদের ডাক্তারনী, পণ্ডিতানী বলা হয়! আসলে আজকাল অহং অভিমানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাই নম্রতা বাড়াবার চেষ্টা না করে অহঙ্কার বাড়াবার কথা বলা ও শেখানো হয়, যেগুলি পতনের কারণ। 'পুরুষ এরূপ করলে আমি কেন করব না? আমি কেন পেছনে থাকব?'—এগুলি শুধু অহঙ্কারের কথা। অহঙ্কারই জন্ম-মৃত্যুর এবং নানাপ্রকার দুঃখ- শোক প্রদানকারী—

সংসৃত মূল সূলপ্রদ নানা। সকল সোকদায়ক অভিমানা॥

(মানস, উত্তরকাণ্ড, ৭৪/৬)

---

* বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া।। (মনু , ২/৬৭)

'নারীদের পক্ষে বৈবাহিক বিধি পালন করাই বৈদিক সংস্কার (যজ্ঞোপবীত), পতির সেবাই গুরুকুলবাস (বেদাধ্যয়ন) এবং গৃহকার্যই অগ্নিহোত্র বলা হয়।'

একই ধর্ম এক ব্রত নেমা। কায়ঁ বচন মন পতি পদ প্রেমা।। (মানস, অরণ্যকাণ্ড, ৫/৫)

অহঙ্কারী ব্যক্তি শাস্ত্রেরকথা কী বুঝবে?তারা বুঝতেই পারে না।

জগতের কল্যাণে জন্যে মাতৃশক্তি অনেক কাজ করেছে। রক্তবীজ ইত্যাদি রাক্ষসদের সংহারও মাতৃশক্তির দ্বারা হয়েছে। মাতৃশক্তিই আমাদের হিন্দু-সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে। আজও প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় যে আমাদের ব্রত-উৎসব, রীতি-রেওয়াজ, মা-বাবার শ্রাদ্ধ ইত্যাদির খবর স্ত্রীলোকেরা যতো রাখে পুরুষেরা ততো নয়। পুরুষ তার নিজের বংশের কথাই ভুলে যায়, কিন্তু পত্নী অন্য বংশের হলেও স্বামীকে বলে অমুক দিন তোমার মা বাবার শ্রাদ্ধ, ইত্যাদি। মন্দিরে, ভজন-কীর্তনে, সৎসঙ্গে যত নারী যোগদান করে, পুরুষেরা করে না। স্নান-ব্রত-দান-পূজা-রামায়ণ পাঠ ইত্যাদি নারীরা যত করে, পুরুষেরা করে না, তাৎপর্য হল এই যে নারীরাই আমাদের সংস্কৃতির রক্ষাকর্ত্রী। তাদের চরিত্র যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কী করে সংস্কৃতির রক্ষা পাবে? একটি শ্লোক আছে —

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টাশ্চ মহীভুজঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলাঙ্গনাঃ।।

(চাণক্যনীতি, ৮/১৮)

'সন্তোষবিহীন ব্রাহ্মণ নষ্ট হয়, সন্তুষ্ট রাজা নষ্ট হয়ে যায়। লজ্জাবতী বেশ্যা নষ্ট হয় এবং লজ্জাহীনা কুলবধূ নষ্ট হয় অর্থাৎ তার পতন হয়।'

বর্তমানে সন্তান-জন্মরোধের কৃত্রিম উপায়ের প্রচার-প্রসারে স্ত্রীজাতির লজ্জা, শীল, সতীত্ব, সচ্চরিত্রতা, সদাচরণ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরিণামে স্ত্রীজাতি কেবল ভোগ্য বস্তু হয়ে উঠছে। স্ত্রী-জাতির চরিত্রই যদি ভ্রষ্ট হয় তাহলে দেশের কি অবস্থা হবে? ভবিষ্যৎবংশধরেরা তাদের প্রথম গুরু মায়ের কাছ থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করবে? স্ত্রী যদি খারাপ হয় তাহলে তার থেকে যে সন্তান (মেয়েছেলে) জন্মায় তারাও খারাপ হবে। যদি স্ত্রী ঠিক থাকে তাহলে স্বামীর স্বভাব খারাপ হলেও সন্তান বিগড়ে যায় না। তাই স্ত্রীজাতির চরিত্র, শীল, লজ্জা ইত্যাদি রক্ষা করা এবং তাদের অপমান,

তিরস্কার থেকে বাঁচানো মানুষমাত্রেরই কর্তব্য।

ধর্মের অবমাননা

ধর্মবিহীন নীতিই বিধবা এবং নীতিবিহীন ধর্ম হলো বিপত্নীক। তাই ধর্ম এবং রাজনীতি উভয়েই অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকা উচিত, তাহলেই সেই শাসন উত্তম হয়। কিন্তু আজকাল ধর্মের অবমাননা করা হচ্ছে। সেই জন্যেই দেশে তিনটি পাপ খুব সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে—ব্যভিচার, হিংসা এবং চুরি। এই তিন পাপের বৃদ্ধিতে দেশ ভয়ংকরভাবে পতনের দিকে যাচ্ছে।

১) **ব্যভিচারের বৃদ্ধি**—সন্তান-জন্ম-রোধের কৃত্রিম উপায়ের প্রচার ও প্রসার দ্বারা ব্যভিচার বেড়ে যাচ্ছে, অবিবাহিত ছেলে-মেয়ে এবং বিধবাদের ভীষণভাবে পতন হচ্ছে, অবিবাহিত মেয়ে এবং বিধবা মহিলারাও গর্ভবতী হয়ে পড়ছে ; কারণ তাদেরও গর্ভনিরোধ করা বা গর্ভপাত করায় কোন অসুবিধা নেই ; লোকের মধ্যে সচ্চরিত্রতা, সদাচার, শীল, লজ্জা ইত্যাদি ভীষণভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

যে গতিতে সন্তান-রোধের উপায়ের প্রসার হচ্ছে, যদি এরূপ হতে থাকে তাহলে সমাজে ব্যভিচার ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়বে। যে-পুরুষ তার অপারেশান (নির্বীজ) করিয়েছে, তার কাছে কোন পরস্ত্রী (বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বিধবা) বলে কিছু থাকে না, এবং যে-মহিলা অপারেশন করিয়েছে, তারপক্ষে পরপুরুষ বলে কিছুই থাকে না। মর্যাদা বা ভয় কিছুই তাদের কাজে অন্তরায়ের নষ্ট করে না। পুরাতন ধর্মের সংস্কারের প্রবাহ থাকায় ততটা পতন চোখে পড়ছেনা,— কিন্তু এই প্রবাহ কতদিন থাকবে ? ঠেলাগাড়ীকে ধাক্কা দিলে সেই ঠেলাগাড়ী কিছুদূর আপনিই চলতে থাকে, তারপর থেমে যায়। তেমনই এই ধার্মিক সংস্কারের প্রবাহ যখন থেমে যাবে, তখন স্ত্রী বা পুরুষ কারোরই কোন মর্যাদা বোধ থাকবে না। বিদেশে তো এখনই শোনা যায় যে মায়ের পরিচিতি আছে কিন্তু বাবার ঠিক নেই !

ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়লে দেশের যে কি অবস্থা হবে, কত অনর্থ হবে—তা এখন অনুমান করা সম্ভব নয়। তখন পশু আর মানুষে কোন পার্থক্য থাকবে না। যেমন কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর, গাধা, শূকর, মানুষও তেমনই হয়ে যাবে। ঐসব পশুদের যেমন আমরা কোন ভাল কথা বোঝাতে পারি না, তেমনই মনুষ্য বেশধারী পশুদেরও কোন ভাল কথা বোঝানো যাবে না।

সন্তান জন্মরোধের মূলে আছে কেবল সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা। সন্তান এইজন্য চাই না যে সে আমাদের সুখভোগের বাধাস্বরূপ। এরূপ অবস্থায় নিজ বাপ-মা, ভাই-বোনকে কীভাবে ভালো লাগবে? চোর যখন চুরি করতে মনস্থ করে তখন কেউ যাতে তা না দেখে সেরূপ ব্যবস্থা করে। ব্যভিচারী যখন কোনও স্ত্রীলোককে পায়, তখন সেও সেইখানে অন্যলোককে পছন্দ করে না*। এইরূপ মানুষের যখন সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে তখন তার অন্য কাউকে ভালো লাগবে না, শুধু তাই নয়, তার ত্যাগী সাধু সন্তদেরও ভালো লাগবে না, সুশিক্ষা প্রদানকারী ও সংযম, মর্যাদা, ধর্মকথা প্রবক্তাদেরও ভালো লাগবে না; কারণ তারা সুখভোগে, ব্যভিচারে বাধা দেয়। নিজ সুখভোগের বাধক মনে করে ভোগী ব্যক্তিরা তাদেরও হত্যা করতে আরম্ভ করবে। ভুল দূর কোরো না, ভুল যারা দেখিয়ে দেয় তাদের দূর করো—এই প্রস্তাব পাস করা হবে! যেমন, বাচ্চাদের সভায় তারা এই প্রস্তাবই পাস করবে যে সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দাও; কারণ এগুলি এক প্রকার জেলখানা। কারণ লেখাপড়াতে পরাধীনতা হয়, স্বাধীনতায় বাধা আসে।

২) হিংসার বৃদ্ধি —দেশে হিংসার খুব বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী এখন দেশে তিন হাজার ছয় শত কসাই খানা আছে। তার মধ্যে দশটি বড় বড় যন্ত্রচালিত কসাইখানা আছে। এগুলিতে প্রতিদিন প্রায়

---

* সুবরণ কো ঢুঁঢ়ত ফিরত, কবি ব্যভিচারী চোর।
চরণ ধরত ধড়কত হিয়ো, নেক ন ভাবত শোর।।

আড়াই লাখ পশু বধ করা হয়, তারমধ্যে অন্তত পঞ্চাশ হাজার গরু কাটা হয়। প্রতিবছর হাজার হাজার টন মাংস রপ্তানী করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিংসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। মনুষ্যহত্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষেতে বিষাক্ত ঔষধ ছেটানো হয়, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় পোকা-মাকড়ের সঙ্গে সঙ্গে উপকারী জীবজন্তুও মারা যাচ্ছে। আসলে ভগবানের সৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বা বাজে কোন জীবই নেই। কিন্তু লোভে অন্ধ মানুষ অন্যান্য জীবদের উপযোগিতা দেখতেই পায় না।

যে-গতিতে দেশে হিংসা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেইভাবে বাড়তে থাকলে একসময় পশুধন নষ্ট হয়ে যাবে এবং মাংসাহারী মানুষ মানুষের মাংসই খেতে শুরু করবে! এইরূপ মানুষকেই রাক্ষস বলা হয়। রামাবতারের সময়ও এমন দশা হয়েছিল যে,রাক্ষসেরা মুনিদের মাংস খেয়ে তাঁদের অস্থি দিয়ে পর্বত করে ফেলেছিল—

অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া। পূছি মুনিন্হ লাগি অতি দায়া।।
জানতহু পূছিয় কস স্বামী। সবদরসী তুম্হ অন্তরযামী।।
নিসিচর নিকর সকল মুনি খায়ে। শুনি রঘুবীর নয়ন জল ছায়ে।

(মানস, অরণ্যকাণ্ড, ৯/৩-৪)

রাক্ষসেরা গৃহস্থদের না খেয়ে মুনিদেরই কেন খেয়েছিল ? অনুমান করা যায় যে ঘাসভক্ষণকারীর মাংসের চেয়ে অন্নভক্ষকদের মাংস বেশী সুস্বাদু হয়ে থাকে। সিংহও যদি একবার নরমাংস খায় তবে সে নরভক্ষকই হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যারা সংযমী, ব্রহ্মচারী এবং সাধু ব্যক্তি, তাদের মাংস সুস্বাদু হওয়াই উচিত; কারণ সংযমী ব্যক্তির সমস্ত জিনিসই উত্তম হয়। আমরা দেখতে পাই যে, যে বাছুরকে বলদ তৈরী করা হয় তার মাংসে ততো শক্তি নেই, যতো শক্তি বলদ না করা বাছুরের থাকে। তাই মুসলিম দেশে বলদের মাংস সস্তা পাওয়া যায় আর বলদ না-করা বাছুরের

মাংস অত্যন্ত দামী হয়ে থাকে। সেই জন্য রাক্ষসেরা গৃহস্থদের না খেয়ে সংযমী মুনিদের খেত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই সংযমশীল হয়ে থাকেন। সংযমী ব্যক্তিদের বিনাশে দেশের কি ভয়ানক পতন হবে!

৩) চুরির বৃদ্ধি—দেশে চুরিও খুব বেড়ে গেছে। সরকার এত বেশী ট্যাক্স ধার্য করেছেন এবং এমন আইন করেছেন যে তার হাত থেকে রক্ষা পেতে লোকে ফাঁকি দেবার বিভিন্ন পথ অনুসন্ধান করেছে। উকিলরাও ট্যাক্স ফাঁকির উপায় জানাচ্ছেন। সরকার বেশী ট্যাক্স এইজন্যই ধার্য করেছেন, যাতে ধনীদের ধন-সম্পত্তি সরকারী কোষাগারে জমা পড়ে। কিন্তু ধনতো পাওয়া গেলই না, উল্টে ধনী ব্যক্তিরা আরো অসৎ হয়ে উঠল। ধনীরাও এত ধূর্ত যে সরকার যদি ডাল দিয়ে যান, তারা তবে পাতায় পাতায় যায়! সরকার যতই আইন প্রণয়ন করুন, তারা কোন না কোন উপায় বার করবেই। এইভাবে সরকার ও জনগণ—উভয়ের মধ্যেই অনৈতিকতা, অধর্ম, অন্যায় বেড়ে যাচ্ছে।

যে-হারে চুরি বাড়ছে, সেই ভাবে বাড়তে থাকলে সমাজে লুটপাট শুরু হয়ে যাবে। বড়ো মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে তেমনই শক্তিশালী লোক কমশক্তির লোকেদের লুট করবে। চোর ডাকাতের সংখ্যা বেশী হলে, ভোটে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে এবং তাদেরই হাতে রাজ্যভার চলে যাবে। এখনই অবস্থা এমন হয়েছে যে ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিক হয়ে বসছে, চাষীরা ক্ষেতের মালিক হয়ে বসছে, ইত্যাদি। প্রাচীনকালে কোন একসময় মহারাজ অশ্বপতি বলেছিলেন—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ ॥

(ছান্দোগ্য, ৫/১১/৫)

'আমার রাজ্যে কোনো চোরও নেই, কৃপণও নেই, কোনো মদ্যাসক্ত ব্যক্তি নেই, কোনো অনাহিতাগ্নি (যারা অগ্নিহোত্র করে না) নেই, কোনো

অবিদ্বান ব্যক্তি নেই এবং কোনো পরস্ত্রীগামী ব্যক্তিও নেই, তাহলে কুল
নারী (বেশ্যা) কী করে হবে?'

কিন্তু এখন পরিস্থিতি উলটে যাচ্ছে অর্থাৎ চোর, কৃপণ, মদ্যপায়ী
অনাহিতাগ্নি, অবিদ্বান, পরস্ত্রীগামী এবং বেশ্যা—এরাই প্রাধান্য পাচ্ছে

ব্যভিচার, হিংসা ও চুরি—এই তিনটি বৃদ্ধি পাওয়ার পরিণা
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে। কত যে ভয়ঙ্কর—আমরা তা অনুমানও করতে পা
না। শাস্ত্রে আছে—

অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।
ত্রীণি তত্র প্রজায়ন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ম্॥

(স্কন্দপুরাণ. মা. কেত, ৩/৪৮

'অপূজ্য ব্যক্তি যেখানে পূজিত হয় এবং পূজ্য ব্যক্তির নিন্দা হয়
সেখানে অকাল, মৃত্যু ও ভয়—এই তিনটি ব্যাপার অবশ্যই ঘটে।'

ভূ-মণ্ডলে ভারত-ভূমির এক বিশেষ প্রভাব আছে, যা প্রত্যক্ষভাবে
দেখা যায় না। এই ভূমিতে ঋষি ও মুনিদের বিশেষ শক্তি নিহিত রয়েছে
এই দেশ সমগ্র বিশ্বের জীবন, হিতকারী। সুতরাং ভারতের পতনে
ভূমণ্ডলের সমস্ত লোকের পতন ও অহিত হবে। এখন যা, হচ্ছে, তা এক
ভয়ঙ্কর মহাভারতের, মহাসংহারের সূচনা। কিন্তু এছাড়া শোধরানোর
শান্তির কোন পথ নজরে আসছে না! যখন ভীষণভাবে লোক সংহার হবে
শক্তি ও সম্পত্তি ধ্বংস হবে, তখনই শান্তি স্থাপনা হতে পারবে।

★ ★ ★

২. গৃহীদের জন্যে

(এই লেখা যদি আপনার মনের অনুকূল নাও হয় তাহলেও অন্তত একবার অবশ্যই দয়া করে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন—এই অনুরোধ।)

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকার পরিবার-পরিকল্পনার কার্যক্রম চালাচ্ছেন; যার জন্য গর্ভরোধ করার জন্যে অথবা গর্ভপাতের মতো মহাপাপ করার জন্য লোকেদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তার জন্যে সরকার নতুন নতুন উপায় বার করে ব্যাপক স্তরে তার প্রচার এবং প্রসার চালাচ্ছেন। সরকারের এই কার্যক্রম কতটা ন্যায়সঙ্গত তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে—

পরিবার-পরিকল্পনার প্রচার ও প্রসারের কারণ

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সূচনা সর্বপ্রথম পশ্চিমী দেশগুলিতে হয়েছিল, যারা ঈশ্বর, ধর্ম এবং পরলোক সম্বন্ধে প্রায়শই অনভিজ্ঞ। তারা চিন্তা করেছিল যে আমাদের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে আমাদের সম্পূর্ণ খাদ্য জুটবে না, থাকবার জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান হবে না, জীবন-নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়বে, আমাদের জীবন-মাত্রার স্তর নেমে যাবে ইত্যাদি। তারা শুধু জনসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলেও এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-নির্বাহের সাধনগুলিও বৃদ্ধিলাভ করে, কারণ প্রয়োজনই হল আবিষ্কারের জননী। ফলে পরিবার-পরিকল্পনার কার্যক্রম থেকে জীবন-নির্বাহের সাধনগুলি তো বৃদ্ধি পায় নি, কিন্তু এমন অনেক দুরাচারবৃত্তির বৃদ্ধি হয়েছে, যার ফলে সমাজের ভীষণ পতন হচ্ছে।

আসলে জীবন-নির্বাহের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু কমে যাবার কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, আসল কারণ হল নিজেদের সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি। ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই মানুষ আরামপ্রিয় এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, যার জন্য তারা জীবননির্বাহের সাধনগুলির উপভোগ বেশী করলেও উৎপাদন কম করে, তার ফলে জীবননির্বাহের বস্তুগুলির অভাব

হয়। শুধু তাই নয়, মানুষ নিজ ইচ্ছাপূরণের জন্য নানারূপ পাপকাজও করতে থাকে, যার মধ্যে গর্ভপাত ইত্যাদি সন্ততিনিরোধের উপায়গুলিও আছে। গীতায় কাম বা ভোগেচ্ছাই সমস্ত পাপের মূল কারণ বলা হয়েছে—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ।।

(গীতা, ৩/৩৭)

'রজোগুণ হতে উৎপন্ন এই কামই ক্রোধ। এটি কিছুতেই তৃপ্ত হয় না ও মহাপাপের কারণ। এই বিষয়ে তুমি একেই শত্রু বলে জেনো।' ভোগ-বিলাসের বস্তুগুলিকে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু বলে মনে করে। তারা সেই সব বস্তুর এতো অধীন হয়েছে যে, সেগুলি ব্যতীত তাদের জীবন দুর্বিষহ বলে মনে হয়, যার কারণ হল আলস্য, প্রমাদ ও আরামপ্রিয়তা। যখন তার পক্ষে নিজ প্রয়োজন পূরণ করাই কঠিন বলে প্রতীত হয়, তখন সে তার সন্তানের প্রয়োজন কী করে মেটাবে! তাই তারা সন্তান জন্মরোধের উপায় কার্যকরী করতে আরম্ভ করেছে। তাদের কামবাসনা এতো বেড়ে গেছে যে তারা নিজের স্ত্রীকে ভোগ-সামগ্রী মনে করাই ঠিক বলে ভাবে, কিন্তু ভোগের প্রাকৃতিক পরিণাম—সন্তান জন্ম—তা ঠিক বলে মনে করে না। তারা চিন্তা করে যে সন্তান না হলে আমার স্ত্রী অনেকদিন যুবতী থাকবে, আমাদের ভোগের যোগ্য থাকবে, কিন্তু তারা এটা বোঝে না যে হাজার চেষ্টা করলেও বৃদ্ধাবস্থা আসবেই এবং তারপর মৃত্যুও আসবে, কারণ তা অনিবার্য। তাদের হৃদয়ে না আছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, না নিজের ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস এবং না আছে নিজ পুরুষার্থের (কর্তব্যের) ওপর বিশ্বাস! অর্থাৎ ঈশ্বর সকলের পালনকর্তা, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্মানুসারে ভাগ্য পায় এবং নিজ পুরুষার্থ (উদ্যোগ) দ্বারা অর্থ উপার্জন করে পরিবার পালন-পোষণ সম্ভব—এই সব ব্যাপার থেকে মানুষের বিশ্বাস সরে গেছে। সেই জন্যই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পরিবার-পরিকল্পনার প্রচার ও প্রসার হচ্ছে।

পরিবার-নিয়ন্ত্রণ কি প্রয়োজন?

জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্যে যে-সব ক্ষতির কথা প্রচার করা হচ্ছে, তা কেবল অহেতুক কল্পনা, তাতে বাস্তবিকতা নেই। পরিবারনিয়ন্ত্রণের সমর্থকেরা বলেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে খাদ্যে টান পড়বে, যার ফলে সকলে সম্পূর্ণ আহার পাবে না। একথা তখনই খাটে যখন অন্ন এক পরিমিত মাত্রায় মজুত থাকে এবং পরে আর অন্ন উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের জন্য চিন্তা করা ব্যক্তিগণ ভুলে যান যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে শুধু খাবার লোকই বাড়ে না, খাবার উৎপাদনকারীও বাড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু পেট নিয়ে জন্মায় না, দুটি হাত, দুটি পা ও একটি মাথাও নিয়ে জন্মায়; যাতে সে শুধু নিজের নয়, বরং বেশ কিছু প্রাণীর ভরণ-পোষণ করতে সক্ষম হয়। আসলে খাদ্যবস্তু তখনই কম হতে পারে, যখন মানুষ কাজ না করে ভোগী, অলস ও আরামপ্রিয় হয়। প্রয়োজনীয়তাই আবিষ্কারের জননী। সুতরাং যখন জনসংখ্যা বাড়বে, তখন তার পালন-পোষণের আনুষঙ্গিকও বাড়বে, খাদ্য-উৎপাদনকারী বাড়বে, বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধিপাবে, উদ্যোগও বাড়বে। আমি যতদূর জানি, পৃথিবীতে মোট সত্তর ভাগ ক্ষেতের জমি আছে, তার মাত্র দশ শতাংশে চাষ হচ্ছে, কেননা ক্ষেতে কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে খাদ্য কম হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, অন্ন উৎপাদন তার থেকে অনেক বেশী হয়েছে। তাই জে. ডি. বার্ণেল প্রভৃতি বিশেযজ্ঞদের অভিমত হলো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আগামী একশো বছর খাদ্য কম পড়ার কোন কারণ নেই। প্রসিদ্ধ ইকনমিস্ট কলিন ক্লার্ক এও বলেছেন যে, ক্ষেতের জমি যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা হয় তাহলে বর্তমান জনসংখ্যার দশগুণ বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যের কোন সমস্যার উদ্ভব হবে না। (Population Growth and Living Standard)

১৮৮০ সালে জার্মানীতে জীবন-নির্বাহের বস্তুর অত্যন্ত অভাব

ছিল, পরে চৌত্রিশ বছরে যখন জার্মানীর জনসংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যায় তখন জীবননির্বাহের বস্তুগুলি কম না হয়ে এত বৃদ্ধি পায় যে কাজের জন্যে বাইরে থেকে লোক আনতে হয়। ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা তীব্রগতিতে বাড়লেও সেখানকার জীবননির্বাহের বস্তুর কোনও অভাব হয়নি। প্রত্যক্ষ ব্যাপার হল যে জগতে মোট জনসংখ্যা যতো বেড়েছে, জীবন-নির্বাহের বস্তু তার থেকে অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবারনিয়ন্ত্রণের সমর্থনে আরও একটি কথা বলা হয় যে, জনসংখ্যা বাড়লে লোকের থাকবার জায়গা পাওয়া মুস্কিল হবে। চিন্তা করে দেখতে হয় যে, এই সৃষ্টি সহস্র কোটি বছর ধরে রয়েছে, কিন্তু কখনো কেউ দেখেনি বা শোনেনি যে কোন সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীতে থাকার স্থান হয়নি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তার জীবন-নির্বাহের ব্যবস্থা করা মানুষের হাতে নেই, তা আছে এই জগৎ সৃষ্টিকারী ভগবানের হাতে। ভগবান বলেছেন যে—

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।

(গীতা, ১৫/১৩)

'আমি এই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ শক্তির দ্বারা সমস্ত প্রাণীদের ধারণ করে থাকি।'

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।

(গীতা, ১৫/১৭)

'সেই অবিনাশী ঈশ্বর ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হয়ে সকলের ভরণ-পোষণ করে থাকেন।'

ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ স্যার উইলিয়াম ক্রোক্স্‌ও ১৮৯৮ সালে এখনকার মতো সতর্কবাণী করেছিলেন যে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে পৃথিবীতে জীবন-নির্বাহের বস্তু আগামী ত্রিশ বছরের পর আমাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারবে না। সুতরাং ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশগুলি

শীঘ্রই দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে পারে।' কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ বছরে দুর্ভিক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, খাদ্য উৎপাদন এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে খাদ্যের দামও অত্যন্ত কমে যায়, যারজন্যে আমেরিকা ইত্যাদি কিছু দেশে তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গম জ্বালিয়ে বা সমুদ্রের জলে ফেলে নষ্ট করতে হয়।

বর্তমানে কয়েক কোটি একর জমি এমনি পড়ে আছে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কোলাহল করার এমন কিছু নেই যে ভবিষ্যতে লোকের খাদ্য বা থাকার স্থান হবে না। ভারতের এতো প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যে বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও সকলেরই জীবন-নির্বাহ হওয়া সম্ভব। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ জগতের মধ্যে সবথেকে বেশী। যতো জিনিস এখানে উৎপন্ন হয়, ততো আর কোথাও হয় না। জনসংখ্যা যদি কম হয়ে যায় তাহলে এর উৎপাদন কে করবে? কারণ জনসংখ্যার ঘাটতি হলে অন্ন ইত্যাদি উৎপাদনকারী কুশলব্যক্তি, উৎপাদনকারী শক্তি এবং উৎপাদনের উপযোগী উপায়ের অভাব হবে।

সবকার যদি জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে সমস্যা বলে মনে করেন তাহলে তার প্রকৃত ও যুক্তিযুক্ত সমাধান হলো এই যে জীবননির্বাহের প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা, নতুন নতুন উপায়ের আবিষ্কার করা। যে-দেশগুলি এই পন্থা গ্রহণ করেছে, তাদের জীবননির্বাহের বস্তুগুলি জনস্যখ্যাবৃদ্ধির থেকেও অনেক বেশী বেড়ে গেছে। কারণ আসলে জীবননির্বাহের বস্তুগুলির সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সম্পর্কই নেই। সেই বস্তুগুলির তখনই অভাব হয়, যখন মানুষ আলস্যপরায়ণ, প্রমাদী, ভোগী ও অকর্মণ্য হয়ে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন না করে। তারা ব্যয় বেশী করলেও কাজ কম করে, যা দেশকে ক্রমশ দরিদ্র করে।

দেশের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য পরিবার-পরিকল্পনার কার্যক্রম মেনে নেওয়া প্রকৃতপক্ষে নিজের পরাজয় স্বীকার করা। তাতে প্রমাণিত হয় যে মানুষ এতো অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে যে সে তার

প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী জীবননির্বাহের উপায়ের বৃদ্ধি না করে নিজেকে শেষ করাই ভাল বলে মনে করে। যেমন গায়ে কোন কাপড় যদি ঠিক মতো না লাগে তবে কাপড়ের আকার ঠিক না করে গা-টি কেটে কাপড়ের মাপে আনার চেষ্টা! মানুষের জন্যেই কাপড়, কাপড়ের জন্যে মানুষ নয়। যদি মানুষ কাপড়ের জন্যে হয়ে থাকে তাহলে তার আর মনুষ্যত্ব থাকে না। কলিন ক্লার্ক লিখেছেন যে ইকমিস্টদের কাজ হল জনসংখ্যা অনুসারে অর্থব্যবস্থা কীভাবে ঠিক করা যায় তাই বলা, অর্থব্যবস্থা অনুযায়ী জনসংখ্যা ঠিক করা নয়। কোনো ইকনমিস্ট, তা তিনি যতো বিদ্বানই হন না কেন বা কোনো সরকার,তা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, এই অধিকার তাদের নেই যে মা বাপকে বলবে যেন তাদের সন্তান কম হয় অথবা একেবারেই না হয়। বরং প্রতিটি মা-বাপের এই অধিকার আছে, তারা ইকনমিস্টদের বা সরকারের কাছে দাবী জানাতে পারে যে, তাঁরা অর্থব্যবস্থা এমন সুদৃঢ়ভাবে যেন করেন যাতে তাঁদের পরিবার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবন-নির্বাহ করতে সক্ষম হয়।'

একটি মানুষে একবার স্ত্রী-সহবাসে যত বীর্যপাত হয়, তাঁতে কয়েক কোটি বাচ্চা জন্মাতে পারে। কারণ এতে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি শুক্রাণু থাকে, এবং প্রত্যেক শুক্রাণু থেকেই একটি করে মানুষ জন্ম নেবার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু তার মধ্যে থেকে কোন ওকটি মাত্র শুক্রাণু স্ত্রীগর্ভে মিশে মানুষ রূপে জন্ম নেয়। মানুষের এই সন্তান উৎপাদক ক্ষমতাকে কোনো দেশের সরকার বা সেই মানুষ নিয়ন্ত্রিত করে নি, তিনিই নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যিনি এই সম্পূর্ণ জগতের রচয়িতা, পালনকর্তা এবং সংহার কর্তা, * জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ, তাকে বাড়ানো-কমানোর কাজ তাঁর দায়িত্ব; সরকারের নয়। তাৎপর্য হলো যে সরকারের অধিকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

---

* ভগবান গীতায় বলেছেন যে—'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ' (৭/১১), 'মানুষের মধ্যে ধর্মের অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ধর্মযুক্ত কাম আমিই;' 'প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ'(১০/২৮) 'সন্তান-উৎপাদনের হেতু কাম আমিই'।

করা নয়, বরং তার কাজ হল জনসংখ্যা অনুসারে জীবন-নির্বাহ এবং তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। যদি জনসংখ্যা এবং জীবন নির্বাহের বস্তুগুলির মধ্যে ভারসাম্য ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়, তবে তা ঠিক না হয়ে বিগড়ে যায়। কারণ জীবন-নির্বাহের মাধ্যম মানুষের জন্যে, মানুষ তার জন্যে নয়। মনুষ্য- জন্ম রোধ করে অন্নের ফলন বাড়াবার চেষ্টা হল তেমনই, যেমন সন্তানকে গর্ভে আসতে না দিয়ে, মায়ের দুধ অধিক পাবার চেষ্টা! যেখানে অধিক গাছ থাকে, সেখানে বৃষ্টি বেশী হয়, তাহলে মানুষ বেশী হলে কি আর অন্ন উৎপাদন বেশী হবে না? প্রত্যক্ষ ব্যাপার হল যে, দেশে যখন পরিবার-পরিকল্পনার কার্যক্রম শুরু হয় নি, তখন খাদ্য যতো সস্তা ছিল, আজ আর ততো নেই।

সরকার যদি জনসংখা নিয়ন্ত্রণেই রাখতে চান তাহলে 'জন্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ' রাখার সঙ্গে 'মৃত্যুর ওপরও নিয়ন্ত্রণ' রাখা উচিত, যদি মৃত্যুর ওপর নিয়ন্ত্রণ যে না রাখতে পারে,তাহলে জন্মের ওপরও নিয়ন্ত্রণ' রাখার কোন অধিকার তার নেই! মানুষের জন্ম যদি কমানো হয় আর মৃত্যু আগের মতো একই ভাবে হতে থাকে, তাহলে ফল কী হবে? যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী ইত্যাদি কারণে যত মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার কোন সীমা নেই। সুতরাং পরিবারপরিকল্পনার দ্বারা সরকার জনসংখ্যার সীমা ঠিক করতে পারেন না যে অমুক সীমা পর্যন্ত জনসংখ্যা কম করা হবে এবং তার থেকে আর কম করা হবে না; যদি কম হয়ে যায় তাহলে তা তৎক্ষণাৎ পূরণ করা হবে। তাৎপর্য হল এই যে জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ভগবানের হাতেই থাকে। কোটি কোটি বছর ধরে এই ব্যবস্থা তিনি ঠিক ভাবে চালিয়ে আসছেন। এতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। যে দেশ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে তারা এর কুফল পেয়েছে।

সন্তান-জন্ম-রোধ নাস্তিকতাবাদরূপী বিষবৃক্ষের ফল। নাস্তিক, অলস-প্রমাদী এবং ভোগী ব্যক্তিরাই সন্তান-নিরোধের কাজ আরম্ভ করেছে, তারাই সন্তান-জন্ম-রোধের সমর্থনে আয়োজিত পরিকল্পনায় প্রভাবিত হয়

এবং এর কুফলও তারা ভোগ করবে।

পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রমের কুফল

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী,ফ্রান্স ইত্যাদিতে বিগত একশো বছর ধরে যে তীব্রগতিতে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু করেছিল, তার ফল বিশ্লেষণ করে আমেরিকার জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ওয়ারেন থম্পসন লিখেছেন যে 'যে-সমাজ পরিবার-পরিকল্পনা করেছে, সেই সমাজে শারীরিক শক্তিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বাড়লেও বুদ্ধিতে কুশলী এবং চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা কম হচ্ছে।' অন্য বিদেশী পণ্ডিত এ্যালডুস হাক্সলে, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতিও এই কথাই বলেছেন, 'পরিবার পরিকল্পনার জন্য মানুষের স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধির স্তর নেমে যাচ্ছে এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও অকুশল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।' কারণ বিবাহেরপর প্রথম প্রথম স্ত্রীর স্বামীর প্রতি এবং স্বামীর স্ত্রীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকে, যার জন্যে তাদের মধ্যে প্রবল ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই প্রথমে যে সন্তান হয়, তারা সেই ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নেয়। তাই প্রারম্ভের সন্তানগণ প্রায়শই ততো ভালো হয় না এবং তারপর যে-সন্তান হয় তাদের থেকে অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট, বিবেকহীন ও ভোগী হয়। তাই গীতায় বলা হয়েছেযে ভোগাকাঙ্ক্ষারহিত যোগীদের কুলেই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন যোগভ্রষ্ট সাধকের জন্ম হয়—

'যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্'

গীতা, (৬/৪২)

পরিবার-পরিকল্পনা করলে সমাজে শিশু এবং যুবকের সংখ্যা কম হয়ে যায় এবংদেশে বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে যায়, তার ফলে দেশের আর্থিক উন্নতি থেমে যায় এবং দেশ নানাদিকে পিছিয়ে পড়ে। শিশু এবং বৃদ্ধদের অনুপাত নষ্ট হওয়াতে সমস্ত দেশের ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়। লর্ড কীন্স এবং প্রোফেসর হেন্সের মত অনুযায়ী 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে অর্থনৈতিক অবস্থা জীবন পায়, জনসংখ্যা কম হলে বেকারি বৃদ্ধি পায়।' কলিন ক্লার্ক লিখেছেন

যে, 'যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মক্ষেত্রের আয়তন বাড়ে তাহলে ব্যক্তি-প্রতি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়, কম হয় না। যদি আমেরিকা ও পশ্চিম য়ুরোপে জনসংখ্যার বৃদ্ধি না হতো তাহলে বর্তমানের নানা উদ্যোগ সঙ্কটগ্রস্ত হতো এবং তার উৎপাদন খরচও অনেক বেড়ে যেত।'

সন্তাননিরোধের ব্যাপক প্রচারে এবং প্রসারে ভোগেচ্ছা অত্যন্ত বেড়ে যায়। ভোগেচ্ছা বাড়লে তার প্রভাব বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয়। মর্যাদা নষ্ট হলে মানুষ পশুর মত হয়ে যায়। তখন অবিবাহিতা এবং বিধবা নারীরাও গর্ভবতী হয়ে যায় ; কারণ গর্ভরোধ করা বা নষ্ট করার উপায় তখন তারা পেয়ে গেছে। ব্যভিচার বৃদ্ধি হলে গনোরিয়া, সিফিলিস, এড্‌স্ ইত্যাদি নানা ভয়ঙ্কর ব্যাধি ছড়ায়। মানুষের চরিত্র নষ্ট হলে দেশের ঘোর অবনতি হয়। পরিবার-পরিকল্পনার এই কুফল পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই স্থানে যৌন অপরাধ অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং কুড়ি বছরেরও কমবয়েসী ছেলে-মেয়েদের মধে যৌন রোগ প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিদেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি এবং ডাইভোর্সের প্রবণতা বৃদ্ধির পেছনেও একটি কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনা। যাদের সন্তান নেই বা সন্তান সংখ্যা কম, সাধারণত সেই স্বামী-স্ত্রীরাই ডাইভোর্স নিয়ে থাকে। কারণ সন্তান জন্মালে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ দৃঢ় হয় এবং তারা মা-বাপ রূপে এক শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে। কিন্তু সন্তাননিরোধের দ্বারা পতি-পত্নীর সম্পর্ক শিথিল হয়ে শুধু মাত্র কাম-বাসনা পূর্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। স্ত্রী মায়ের উচ্চ পদ লাভ করে না, সে পুরুষের ভোগ্যা হয়েই থাকে, যা তার পতনের মূল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যখন শৈথিল্য আসে তখন সমাজে ডাইভোর্স, ব্যভিচার ইত্যাদি দোষের আধিক্য দেখা যায়, যার ফলে ভীষণ দুঃখ আসে।

মা হলেই স্ত্রীলোক শ্রদ্ধা ও সম্মান পায়, ভোগ্যা হলে নয়। ভোগ্যা হয়ে থাকলে যখন সে আর ভোগের যোগ্য থাকে না, তখন তার দেখাশুনা কে করবে ? তখন তারা লাঞ্ছনা বাড়তে থাকে। স্বামী যদি তাকে ডাইভোর্স করে, আর ছেলে না থাকে, তবে কে তাকে দেখবে ? যদি সন্তান না থাকে তাহলে বৃদ্ধা অথবা অসুস্থ স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা কে করবে ? কারণ মায়ের যাতে কষ্ট না হয়, তার যাতে সেবা-শুশ্রূষা হয়—তা ছেলে-নাতি যত ভাবে,ততোআর কেউ নয়।

মানুষের মনে যখন এই স্বার্থপরতা আসে যে কম সন্তান হলে তারা সুখী থাকবে, তাদের জীবন সুখের হবে, তখন তাদের এই মনোভাব কেবলমাত্র কম বাচ্চা হওয়া বা বাচ্চা না-হওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন তার স্বার্থ সিদ্ধির পথে নিজের সন্তানকেই শুধু প্রতিবন্ধক বলে মনে হয় না, তখন বৃদ্ধ মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিবারের রুগ্ন, পঙ্গু, অসমর্থ, দরিদ্র পরিজনদেরও প্রতিবন্ধক বলে মনে হয় ! পশ্চিমী দেশগুলিতে তাই দেখা যায়। যারা নিজ সন্তানের পালন পোষণ করতেই নারাজ, তারা অপরের পালন-পোষণ করবে কী ভাবে ? সুতরাং পরিবার-পরিকল্পনার প্রচার ও প্রসারে মানুষের মধ্যে সেবা, ত্যাগ,প্রেম,পরহিতের ভাব ইত্যাদি চিন্তাধারা নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা আগের থেকে বেশী স্বার্থপর হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু নিজের পরিবার, তার পরিস্থিতি, নিজের স্বার্থ দেখেই পরিবার সীমায়িত করে, দেশের অবস্থা দেখে নয়। দেশের শক্তি ঠিক রাখার জন্যে কমপক্ষে কত জনসংখ্যা প্রয়োজন, তা কোনো ব্যক্তি চিন্তা করে না। যারা কেবল এক বা দুটি সন্তানের জন্ম দেয়, তারা প্রায়শই আশা করে যে তাদের সন্তান তাদের কাছে থেকে তাদের সেবা করবে, তাদের স্বার্থ দেখবে, তাদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করবে *। আমাদের সন্তান দেশের সেবা করবে, সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে দেশকে শত্রুর হাত থেকে

---

* মাতু পিতা বালকন্হি বোলাবাহিঁ। উদর ভ'রে সোই ধর্ম সিখাবহিঁ ॥
(মানস, উত্তরকাণ্ড, ৯৯/৪)

রক্ষা করবে—এই ভাব সাধারণত সেই সব পিতামাতার থাকে, যাদের সন্তান সংখ্যা বেশী। একটি-দুটি সন্তান হলে ঘরের কাজই পূরণ হয় না, তাহলে সৈন্য দলে যাবে কে? সাধু কে হবে? শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কে হবে আর কেই বা হবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা? বেশী সন্তান হলে কেউ যাবে সৈন্যদলে, কেউ চাষ করবে, কেউ ব্যবসা করবে, কেউ তৈরী করবে ফ্যাক্টরী। পরিবার-পরিকল্পনার সমর্থকেরা বলে থাকে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে লোক আনাহারে মরবে, কিন্তু আমি বলি যে জনসংখ্যা কম হলেই লোক অনাহারে মরবে, কারণ চাষ করার জন্য এখনই লোক কম পাওয়া যায়, পরে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা আরও কম হলে লোক কোথায় পাওয়া যাবে? যা এখন পাওয়া যায়, তারা পয়সা পুরো নিলেও মন দিয়ে পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করে না। এটি প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে ঘরের ছেলে যত মন দিয়ে পরিশ্রমের সঙ্গে নিজের ঘরের কাজ করে, মজুর বা পয়সা দিয়ে-রাখা লোক ততো কাজ করে না। বিশেষজ্ঞদের অনুমান যে যদি এক হাজার ব্যক্তি এইভাবে দুটি করে সন্তান উৎপাদন করে, তাহলে ত্রিশ বছর পরে জনসংখ্যা কমে ৩৩১ হবে, ষাট বছর পরে ১৮৬ হবে এবং দেড়শো বছর পরে তা ১৩ তে পরিণত হবে। জনসংখ্যা যদি অত্যধিক কমে যায় তাহলে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক প্রকোপ এবং শত্রু থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয় না এবং ফলস্বরূপ নিজের অস্তিত্বই মুছে যেতে বসে। সুতরাং যে-জাতি পরিবার-পরিকল্পনা করে, তারা আসলে আত্মহত্যাই করে থাকে।

আমেরিকা জাপানে যে এ্যাটম বম বর্ষণ করেছিলো, তার শক্তি ছিল ২০ হাজার টি এন টি আর এতে মারা গিয়েছিল ৭৮, ১৫০ জন মানুষ, ৩৭, ৪২৫ জন আহত হয়েছিল ও ১৩, ০৮৩ ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়েছিল। আর এখন দশ কোটি টি এন টি বা তার থেকে অধিক শক্তিসম্পন্ন এ্যাটম বম তৈরী করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে যদি এইরূপ বিনাশকারী অস্ত্রাদির সাহায্যে যুদ্ধ করা হয় তাহলে যুদ্ধের অন্তর্গত দেশগুলিতে জনসংখ্যা হঠাৎ যে কত
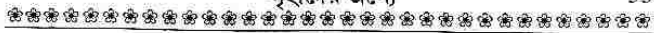
কমে যাবে-তার আন্দাজ করা মুশকিল। যে-দেশের জনসংখ্যা আগে থেকেই কম করা হয়েছে, এরূপ যুদ্ধে তাদের সর্বতোভাবে বিনাশ হবেই।

প্রায় দু হাজার বছর আগে য়ুনানেও গর্ভপাত ইত্যাদির প্রচলন ছিল এবং তার জনসংখ্যা কমে যাচ্ছিল। সেই সময় ঐ স্থানে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই দুই প্রকার লোকসান য়ুনান সইতে পারে নি এবং ফলে তাকে অন্যের গোলাম হয়ে থাকতে হয়। কোনো সময় ফ্রান্সকে জগতের প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে ধরা হতো। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ তার পরাজয় হলে, মার্শাল পীটা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, 'জনসংখ্যা কম হওয়াই আমাদের পরাজয়ের মূল কারণ।'

রাজনীতির দৃষ্টিতে দেখলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। জনসংখ্যা কমে গেলে পরিণামে রাজনৈতিক শক্তি হ্রাস পায়। প্রোফেসার অরগাঁস্কি অলব্রেনো বলেছেন যে, য়ুরোপকে বিশ্বের সব থেকে বড়শক্তি রূপে তৈরী করার পেছনে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই প্রধান কারণ।' (পপুলেশন এণ্ড পলিটিক্স)। পশ্চিমী দেশগুলিতে জনসংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তিও হ্রাস পেয়েছিল, যা বিশ্বযুদ্ধের পর জানা যায়। তাই ঐ সব দেশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে। শুধু তাই নয়, নিজের আগের শক্তি ফিরে পাবার জন্য পশ্চিমী দেশগুলি পূর্বের দেশগুলির ওপর জোর চালাচ্ছে যাতে তারা পরিবার-পরিকল্পনার সাহায্যে নিজ জনসংখ্যা কম করে।আর্থার মেক কারমেক স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বিকশিত দেশগুলি চায় যাতে বিকাশশীল দেশগুলির জনসংখ্যা কম হয়, কারণ তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এই দেশগুলি তাদের উচ্চ জীবন-স্তর এবং রাজনৈতিক সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করে। তাদের উদ্দেশ্য হল পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিকে আরও পিছিয়ে দেওয়া, প্রধানত কৃষ্ণবর্ণের লোকেদের যাতে গৌরবর্ণের লোকেদের আধিপত্য বজায় থাকে।' (এ্যানালিসিস অফ লাইফ্ ইন সোসাইটি)।এই কারণেই বিশ্বব্যাঙ্ক এবং পশ্চিমী দেশগুলি ভারতকে এই শর্তে ঋণ দেয় যে সে যেন নিজ

জনসংখ্যা যতদূর সম্ভব কমের মধ্যে সীমিত রাখে। কারণ ভারতে জনসংখ্যা কম হলে এবং তাদের ঋণ অধিক হলে ভারতের ওপর ঐ দেশগুলি রাজত্ব করতে পারবে।

বর্তমানে ভোট প্রণালীর জনসংখ্যার সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্ক আছে। এই প্রণালী অনুসারে একশত মূর্খ নিরানব্বই জন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একশত মূর্খ মিলেও একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সমান হতে পারে না। বিচার করে দেখতে হয় যে, সমাজে বিদ্বানের সংখ্যা বেশী না মূর্খের? ভালোলোকের সংখ্যা বেশী না দুষ্টের? বিশ্বাসীর সংখ্যা অধিক না অবিশ্বাসীর? সংখ্যায় যারা অধিক হবে তারাই ভোটে জিতবে এবং তারাই দেশ শাসন করবে। যে ধরনের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, তারাই দেশ শাসন করবে।

পারিবারিক দৃষ্টিতে দেখলেও লক্ষ্য করা যায় যে, যে পরিবারে বেশী সন্তান থাকে, তারাই বেশী উন্নত হয়। প্রোফেসার কোলন ক্লার্ক লিখেছেন যে, অধিক সন্তানসম্পন্ন এবং অল্প সন্তানসম্পন্ন—উভয় প্রকারের পরিবারের ওপর অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে ছোট পরিবারের বাচ্চাদের থেকে বড় পরিবারের বাচ্চারা জীবনে বেশী সফলতা লাভ করে' (ডেইলি টাইম্স্, ১৫/৩/৫৯)।

মনোজ্ঞিানীদের কথায়, যে বাচ্চাদের নিজ ছোট বা বড়ো ভাই-বোনেদের সঙ্গে খেলা-ধূলা, ওঠা-বসা, পরস্পরের আমোদ-আহ্লাদ করার সুযোগ হয় নি, তাদের ঠিকমতো মানসিক বিকাশ হয় না এবং তারা নানা প্রকার নৈতিক গুণ থেকে বঞ্চিত হয়। যদি নিজের ভাই-বোনেদের মধ্যে বয়সের অনেক তফাত হয় (নিজ বয়সের কাছাকাছি ভাই বোন না থাকলে) তাহলে মানসিক রোগ (নিউরোসিস) পর্যন্ত হতে পারে।

যৌবনকালেই স্ত্রী ও পুরুষ সন্তান উৎপাদনের যোগ্য হয়, যখন তাদের আর এই ক্ষমতা থাকে না, তখন তাদের বৃদ্ধ বলা হয়। তাৎপর্য হল এই যে সন্তান উৎপাদনের শক্তি না থাকলে মনুষের শারীরিক ও মানসিক

শক্তিও শিথিল হয়ে যায়। নারীদেহ প্রধানত সন্তান উৎপাদনের জন্যই সৃষ্ট, যৌবনের প্রারম্ভেই তাদের মাসিক ধর্ম শুরু হয়, যা প্রতি মাসে তাকে গর্ভবতী করার যোগ্য তৈরী করে। গর্ভবতী হলে তার দেহের বেশীর ভাগ শক্তি শিশুর পালন-পোষণে ব্যাপৃত হয়। তাই নারী যতো ভালোভাবে শিশুর পাল-পোষণ করতে পারে, পুরুষ ততো নয়। স্ত্রীর যদি মৃত্যু হয় তাহলে পুরুষ শিশুকে ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী নিজে অনেক কষ্ট করে শিশুকে বড় করে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করে। কারণ নারী হল মাতৃশক্তি, তাঁদের মধ্যে পালন করার বিশেষ যোগ্যতা , স্নেহ ও কার্যক্ষমতা থাকে। তাই বলা হয়েছে—'**মাত্রা সমং নাস্তি শরীরপোষণম্**' অর্থাৎ মাতার সমান পালনকর্ত্রী আর কেউ নেই। মাতা রূপে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা বেশী অধিকারদেওয়া হয়েছে-'**সহস্রং তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে**' (মনু, ২/১৪৫) অর্থাৎ মাতার স্থান পিতার থেকে সহস্রগুণ অধিক বলে মানা হয়। বর্তমানে গর্ভ-পরীক্ষা করে কন্যা দেখলে, তা নষ্ট করা হয়। এ কি মাতৃশক্তির ঘোরতর অপমান নয়? এই কি নারীকে সমান অধিকার প্রদান? পরিবার-পরিকল্পনার দ্বারা নারীকে ভোগ্যা তৈরী করা হচ্ছে। ভোগ্যা স্ত্রী বেশ্যার সমান। এ কি নারী জাতির অপমান নয়?

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ এ্যালোক্সিস্ কারেল লিখেছেন যে, 'সন্তান উৎপাদন-করা নারীজাতির কর্তব্য এবং এই কর্তব্য-পালন করা নারীজাতির পূর্ণতার জন্য অনিবার্য' (ম্যান, দি আন্‌নোন)। এইরূপ যৌন মনোবিজ্ঞানী ডাঃ অসয়োল্ড সোয়ার্জ লিখেছেন যে, 'কাম-বাসনা সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্ত্রীশরীর নির্মিত হয়েছে প্রধানত গর্ভধারণ ও সন্তানের জন্মদানের জন্যেই। তাই যদি তাকে সন্তান উৎপাদনে বাধা দেওয়া হয় তাহলে তার শরীর এবং মনের ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়বে, যার ফলে তার ব্যক্তিত্বে হীনভাব, রুক্ষতা বা নীরসতা দেখা যাবে' (দি সাইকোলজি অফ সেক্স)। যে-পুরুষ স্ত্রী সঙ্গ করে অথচ সন্তান চায় না, সে

মূর্খ চাষার মত, যে হলকর্ষণ করে কিন্তু বীজ বপন করে না অথবা মূর্খ ব্যক্তির ন্যায়, যে জিভের আস্বাদনের জন্য খাদ্য চর্বণ করে এবং গলাধঃকরণ না করে বাইরে ফেলে দেয়!

ডাঃ মেরী শারলীব তাঁর চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার কথায় লিখেছেন যে,'সন্তান জন্মরোধের উপায় কার্যকরী করলে তার অনিবার্য ফল হলো স্ত্রীর প্রসন্নতা কমে যাওয়া, খিটখিটে হওয়া, অনিদ্রা, উদ্বিগ্নতা, হৃদয় এবং মাথার দুর্বলতা, রক্তপ্রবাহের অল্পতা, হাতে পায়ে অবশভাব, মাসিকের অনিয়মিতভাব ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হওয়া।' অন্য ডাক্তারগণও এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, এর ফলে নারীদের স্মরণ-শক্তি ক্ষীণ হওয়া, পাগলভাব, স্বভাবে উত্তেজনা, মাসিক ধর্মে কষ্ট ও সময়মত না হওয়া, কোমরব্যথা, সৌন্দর্য নষ্ট হওয়া ইত্যাদি দোষ দেখা দেয়। যদি এই নারী কখনও গর্ভবতী হয় তাহলে তাকে গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালে অত্যধিক কষ্ট সইতে হয়।ডাঃ আর্নল্ড লরেঞ্জ তাঁর বই 'লাইফ শর্টনিং হ্যাবিটস্ এণ্ড রিজুভিনেশন'-এ সন্তান-রোধের উপায়ের মধ্যে ক্ষতির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সন্তান জন্ম-রোধের বিষয়ে ডাক্তারদের মত হল এই যে,'এর কোন উপায়টিই বিশ্বসনীয় বা হানিবর্জিত নয়।' ইংল্যাণ্ডের ডাঃ রেনিয়েল ডিউকস্ প্রভৃতির মত হল যে,'সন্তান নিরোধক ট্যাবলেটের দ্বারা ক্যান্সারের মত ভয়ঙ্কর রোগ উৎপন্ন হতে পারে।'

তাৎপর্য হল এই যে নিজের সুখভোগের জন্য করা সন্ততি-নিরোধ মূর্খতাবশত প্রারম্ভে অমৃতের ন্যায় প্রতীত হলেও, পরিণামে তা বিষের মতো বিনাশকারী হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্।।

(১৮/৩৮)

'যে সুখ ইন্দ্রিয়াদি ও বিষয় সংযোগে প্রারম্ভে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষের ন্যায় হয়, সেই সুখকে রাজসিক সুখ বলা হয়।'

পরিবারপরিকল্পনার কুফল ভোগকারী দেশগুলির প্রতিক্রিয়া

পরিবারপরিকল্পনার কুফল ভোগার পর অনেক দেশ সন্তান-নিয়ন্ত্রণের ওপর প্রতিবন্ধকতা করছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপায় জারী করছে। জার্মান সরকার সন্তান জন্ম-রোধের উপায়ের প্রচার এবং প্রসারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিয়েছে এবং বিবাহে উৎসাহিত করার জন্য বিবাহ-ঋণ দেওয়া শুরু করেছে। ১৯৩৫ সালে একটি আইন করা হয়েছে, সেই অনুসারে একটি সন্তান হলে ইনকাম ট্যাক্সে ১৫% ছাড়, দুটি বাচ্চা হলে ৩৫% ছাড়, তিনটি বাচ্চা হলে ৫৫% ছাড়, চারটি বাচ্চা হলে ৭৫% ছাড়, পাঁচটি বাচ্চা হলে ৯৫% ছাড় এবং ছটি বাচ্চা হলে ইনকামট্যাক্স রদ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে সেখানে জনসংখ্যা পর্যাপ্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফ্রান্স সরকারও সন্তাননিয়ন্ত্রণের প্রচার এবং প্রসারের ওপর কঠোর প্রতিবন্ধকতা করছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবন করছে। অধিক সন্তান উৎপাদনকারীদের ট্যাক্স কমানো হয়েছে, তাদের বেতন ও পেনশন বাড়ানো হয়েছে এবং তাদের নানাপ্রকার আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে এবং পুরস্কারও দেওয়া হচ্ছে।

ইংলণ্ডের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জনসংখ্যা কম দেখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখ্যচিকিৎসাধিকারী স্যার জর্জ ন্যুমেন সতর্কতা জারী করেছিলেন যে জনসংখ্যার এই ঘাটতি যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে ব্রিটেন বিশ্বের চতুর্থ শক্তিতে নেমে আসবে। এই অভাব দূর করার জন্যে 'লীগ অফ ন্যাশানাল লাইফ' নামক সমিতি গঠন করা হয়েছিল। সেখানকার সদস্যরা বিচার বিবেচনা করেছিলেন যে যদি ইংল্যাণ্ড তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় তাহলে তার জনসংখ্যা হ্রাসের ওপর সত্বর বাধা সৃষ্টি করতে হবে। সেইজন্য ১৯৪৪ সালে 'রয়েল কমিশন' স্থাপন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যার ঘাটতি দূর করার নানা উপায়ের অনুসন্ধান করা। ১৯৪৯ সালে সেটি তার রিপোর্টে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনেক উপায় চালু

করার পরামর্শ দিয়েছিল। যেমন—অধিক সন্তান যাদের আছে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে, তাদের ট্যাক্স কম দিতে হবে, এমন বাড়ী তৈরী করা হবে বা নির্মাণে সহায়তা করা হবে, যাতে শোবার জন্য তিনের বেশী ঘর থাকবে, ইত্যাদি। সেই অনুযায়ী ইংলণ্ডে নানা আইন তৈরী করা হয়েছে। লোক তখন বেশী সন্তান উৎপাদনে আগ্রহী হল—তার জন্য সেখানে বিভিন্ন প্রকারের আর্থিক সাহায্য, যেমন লেখা-পড়া, বাড়ীঘর ইত্যাদির সুবিধা দিতে শুরু করে। ফলে সেখানে তীব্রগতিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়।

উপরিউক্ত দেশ ছাড়া সুইডেন, ইটালী ইত্যাদি দেশগুলিও সন্তান জন্ম-রোধের ওপর প্রতিবন্ধতা করে। ইটালীতে তো এমন আইনও তৈরী হয়েছে যে সন্তান-জন্ম-রোধের প্রচার এবং প্রসারকারীদের এক বছরের জেল বা জরিমানাও করা হতে পারে। আশ্চর্যের কথা হল এই যে, যে-কুফল পশ্চিমী দেশগুলি ভোগ করেছে, তা দেখেও ভারত সরকার এই কার্যক্রমে উৎসাহ দিয়ে চলেছে–**'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ'**!*

---

* এই বিষয়ে আরও তথ্য জানার জন্য গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত 'মহাপাপ থেকে বাঁচো' নামক বই পড়া উচিত।

৩. ভয়ানক পাপ থেকে বাঁচো

অশুদ্ধ প্রকৃতির সংসারী মানুষেরা জগতেই সুখ মনে করে। জাগতিক সুখের চেয়েও অন্য কোন এক অনুপম পারমার্থিক সুখ আছে একথা তারা মোটেই জানে না। এরূপ আসুরী স্বভাবসম্পন্ন মানুষই জাগতিক ভোগের জন্যে বলে থাকে যা কিছু আছে, ব্যস, এই-ই সব— **'কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ'** (গীতা, ১৬/১১), **'নান্যদস্তীতি বাদিনঃ'** (গীতা, ২/৪২)। অপরপক্ষে শুদ্ধ প্রকৃতিসম্পন্ন পারমার্থিক সাধকেরা পরমাত্মাতেই সুখ অনুভব করে এবং এর থেকেও বেশী আর কোন সুখ আছে—তা তারা মনেই করে না—**'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'** (গীতা, ৬/২২)।

সংসারী মানুষ এবং সাধক—দুইয়ের পার্থক্য এই যে সংসারী মানুষ পারমার্থিক সুখের কথা জানেই না, আর সাধক পারমার্থিক সুখের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক সুখের কথাও জানেন। যেমন বালক শুধু বালক ভাবকেই দেখে, যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থার কথা সে অনুভব করতে পারে না। বালকের থেকে যুবক বেশী জানে, কারণ সে বালকত্ব এবং যৌবন দুই-ই জানে। তাই বালক যদি তাকে ঠকাতে চায়, যুবক তাতে ঠকে না। যুবকের থেকে বৃদ্ধ আরও বেশী জানে; কারণ তিনি বালকভাব, যুবকভাব এবং বৃদ্ধভাব এই তিনটিই অনুভব করেছেন। মানুষ যে-বিষয়ে জানে না, তাকে সেই বিষয়ে বালক বলা হয়*। কারণ অল্পবুদ্ধিকে বলা হয় বালকভাব এবং অল্পবুদ্ধিকেই শিক্ষা প্রদান করা হয়। সেইভাবে দেখলে সংসারে আসক্তি-সম্পন্নব্যক্তিরা হলো বালক। এদের থেকে সাধক বেশী জানেন, সাধকের থেকে বেশী জানেন সিদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা। তত্ত্বজ্ঞ

---

* সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ. (গীতা, ৫/৪)

'বালক অর্থাৎ অবুঝ ব্যক্তিরা সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক পৃথক ফলপ্রদানকারী বলে থাকে, পণ্ডিতেরা তা বলেন না।'

মহাত্মাই প্রকৃতপক্ষে পূর্ণভাবে জ্ঞানী হন☆; কারণ প্রথমে সাধারণ মানুষ ছিলেন, পরে বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, সৎসঙ্গ করেছেন, সাধনা করেছেন, তারপর তত্ত্ব লাভ করেছেন। এই ভাবে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবই তিনি সম্পূর্ণভাবে জানেন, তিনি জগৎকেও 'সম্পূর্ণভাবে জানেন এবং পরমাত্মতত্ত্বকেও জানেন❖।

সংসারী মানুষ সাংসারিক বিষয়ই সম্পূর্ণভাবে জানে না, পারিমার্থিক বিষয় তো দূরের কথা! কারণ সাংসারিক জ্ঞান সংসার থেকে পৃথক (আসক্তিশূন্য) হলে তবে হয়, আর পরমাত্মার জ্ঞান পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হলে তবেই হয়। অশুদ্ধ প্রকৃতির জ্ঞান অশুদ্ধ প্রকৃতি থেকে পৃথক হলেই তবেই হয়। অশুদ্ধ প্রকৃতি থেকে আলদা না হলে মানুষ শুদ্ধ প্রকৃতিকে মর্যাদা দিতে পারে না। আর একটি বড় পার্থক্য হলো এই যে সংসারী (অশুদ্ধ প্রকৃতিসম্পন্ন) মানুষ পারমার্থিক (শুদ্ধ প্রকৃতিসম্পন্ন) সাধকদের সঙ্গে শত্রুতা করে থাকে✿; কিন্তু পারমার্থিক সাধকদের সংসারী

☆ ভগবান তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাদের 'সর্ববিৎ' (সর্বজ্ঞ) বলেছেন ঃ

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।। (গীতা, ১৫/১৯)

'হে ভরতবংশীয় অর্জুন! এইভাবে মোহবর্জিত যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানে, সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্বপ্রকারে আমারই ভজনা করে থাকে।'

❖ যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।। (গীতা, ২/৬৯)

'সমস্ত মানুষের যখন রাত্রি (পরমাত্মাতে বিমুখতা), তাতে সংযমী মানুষ জেগে থাকেন, আর যাতে সাধারণ মানুষ জেগে থাকেন (ভোগে ব্যাপৃত হন), তা তত্ত্বজ্ঞ মানুষের দৃষ্টিতে রাত্রিস্বরূপ।'

✿ মৃগমীনসজ্জনানাং তৃণজলসন্তোষবিহিতবৃত্তীনাম্।
লুব্ধকধীবরপিশুনা নিষ্কারণবৈরিণৌ জগতি।।
(নারদপুরাণ, পূর্ব, ৩৭/৩৮; ভর্তৃহরিনীতি, ৬১)

'হরিণ, মাছ ও সজ্জন মানুষ ক্রমশ তৃণ, জল ও সন্তোষে নিজ জীবননির্বাহ করে (কাউকে দুঃখ দেয় না); কিন্তু ব্যাধ, ধীবর এবং দুষ্ট লোক অকারণে এদের সঙ্গে শত্রুতা করে থাকে।'

লোকদের সঙ্গে শত্রুতা নেই❖।

গর্ভপাত, জন্মনিরোধ ইত্যাদির দ্বারা কৃত্রিমভাবে সন্তাননিরোধ করা অশুদ্ধ প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষের কাজ। অশুদ্ধ প্রকৃতি বেড়ে গেলে তা দূর করা কঠিন হয়। যেমন দীর্ঘ সময় ধরে কোন নেশা করলে তা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন হয়, তেমনই কৃত্রিম উপায়ে সন্তান নিরোধের অভ্যাস বা রীতি-রেওয়াজ হয়ে গেলে তা দূর করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে*। এই প্রচলনে মানবজাতির বিনাশ হবে, মনুষ্যত্বের তো বিনাশ হবেই। কারণ বুদ্ধি যদি একবার বিনাশের দিকে যায়, তবে তা সেদিকেই চলতে থাকে, সেদিকেই তার বিকাশ হতে থাকে, বিনাশের নতুন নতুন উপায় আবিষ্কৃত হতে থাকে। এর ফলে ভয়ঙ্কর অনর্থ ঘটে।

এখন দেশে ভোগেচ্ছার তাণ্ডব নৃত্য হচ্ছে। সন্তান-জন্ম রোধের পেছনেও ভোগেচ্ছা ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। ভোগী ব্যক্তি বেড়ে যাওয়ায় উদ্যমী ব্যক্তির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। উদ্যমী ব্যক্তির অভাব হলে উপাদন কম ও খরচ বেশী হয়; কারণ ভোগীদেরই সাংসারিক প্রয়োজনীয়তা বেশী থাকে, ত্যাগীদের নয়। খরচ বেশী হওয়ার ফলে দেশ ঋণী হয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃত পক্ষে ভারতের পরিবার পরিকল্পনার কোনো প্রয়োজনই নেই। কারণ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অপার। ভারতভূমি সূর্যের

❖ উমা জে রামচরণ রত বিগত কাম মদ ক্রোধ।
নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগৎ কেহি সন করহিঁ বিরোধ।।

(মানস, উত্তরকাণ্ড, ১১২ খ)

* উদাহরণস্বরূপ তামিলনাড়ুর উসলিয়ামপট্টী এবং তার আশ-পাশের গাঁয়ে নবজাত কন্যার হত্যাকরার রীতি এমন বেড়ে গিয়েছিল যে তা বন্ধ করতে 'ভারতীয় বালক-কল্যাণ পরিষদ্' এবং সেখানকার সরকারের সমস্ত প্রয়াস বিফল হচ্ছে সেখানে ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে ৪১০টি শিশুকন্যাকে হত্যা করা হয়েছে। এই ব্যাপার নানা সংবাদ পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে।

কিরণস্নাত। ভারতের ছয়টি ঋতু এবং নানা প্রকার জলবায়ু। এরূপ আর অন্য কোন দেশে নেই। ভারতে যত প্রকার ঔষধি, লতা-গুল্ম, বৃক্ষ-খনিজ পদার্থ, অন্ন-ফল-সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, ততো আর কোন দেশে হয় না। যত প্রকার বিদ্যা, কলা-কৌশল, ইত্যাদি ভারতে পাওয়া যায় তা অন্য কোন দেশে নয়।এক একটি বিষয়ের ওপর যত গ্রন্থ এই দেশে পাওয়া যায়, অন্য কোনো দেশে তা পাওয়া যায় না। আবিষ্কারের জন্যে ভারতের কাছে নানা সামগ্রী আছে। ভারতে যেমন যোদ্ধা, সতী, যোগী, ত্যাগী, সাধু, সিদ্ধ পুরুষ, ঋষি-মুনি, তপস্বী, শাসক, সংযমী ব্যক্তি জন্মেছেন, তেমন অন্য কোন দেশে হয় নি। সরকার যদি এখানকার বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ দেন যাতে তাঁরা বিদেশে না গিয়ে এখানেই কাজ করেন তাহলে ভারতে বহু বিশেষ আবিষ্কার হতে পারে, যাতে এইদেশ দুনিয়াকে শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হয়।

জনসংখ্যা যদি বেশী হয়, উৎপাদনও বেশী হবে, যাতে অন্যান্য দেশও লাভবান হবে। প্রত্যক্ষ ব্যাপার হল, যখন জনসংখ্যা কম ছিল তখন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হোত। কিন্তু এখন জনসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুও বাইরের দেশে রপ্তানী হচ্ছে। সরকারের কাছেএখবর গোপন নেই, কিন্তু এদিকে লক্ষ্য নেই।আবশ্যকতাই আবিষ্কারের জননী। জনসংখ্যা বাড়লে জীবননির্বাহের উপায়ও বাড়তে থাকে, খাদ্য-উৎপাদনও বাড়ে, বস্ত্রর উৎপাদনও বেড়ে যায়, উদ্যোগও বাড়ে। কিন্তু আজকাল সবেতেই বিপরীত বুদ্ধি। লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার, অথচ উৎপাদনকারীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। সরকারের কর্তব্য হল নিজের দেশে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক নাগরিকের জীবন-নির্বাহের ব্যবস্থা করা। তাদের জন্মের ওপর বাধাপ্রদান করা নয়। একটি লোকের চাষ করার জন্য প্রায় আটশো বিঘে জমি রয়েছে। তার দুটি ছেলে একজন বোম্বেতে চাকরীরত, অন্যজন বাবা-মার কাছে থেকে তাদের

সেবায় নিযুক্ত। তাদের চাষাবাদ দেখার কেউ নেই। জনসংখ্যা হ্রাস করলে এরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রকৃতির কাজ, মানুষের নয়। প্রকৃতির দ্বারা যে কাজ হয়, তাতে সকলেরই মঙ্গল হয়, কারণ তা ঈশ্বরের বিধানে চালিত হয়*। অপরপক্ষে মানুষ ভোগবুদ্ধির দ্বারা যে কাজ করে, তাতে সকলেরই মহাক্ষতি হয়। মানুষ প্রকৃতির কার্যে হস্তক্ষেপ করলে তার ফল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে।

হাজার-কোটি বছর ধরে এই সৃষ্টি চলে আসছে। প্রকৃতি সর্বদা জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। জনসংখ্যা যখনই খুব বেড়ে যায়, তখনই ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বন্যা, অকাল, যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদিতে তা কমে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইতিহাসে কখনও এমন শোনা যায় নি যে লোকে ব্যাপক হারে গর্ভপাত, জন্মরোধ ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে জনসংখ্যা কম করার চেষ্টা করেছেন। কুকুর, বেড়াল, শূকর ইত্যাদি পশুরা এক এক বার বেশ কয়েকটি বাচ্চার জন্ম দেয়, তারা কোনো পরিবার-পরিকল্পনাও করে না, তা সত্ত্বেও রাস্তা ঘাটে এইসব পশুর পাল দেখা যায় না অর্থাৎ এদের দ্বারা গ্রাম-শহর ভরে গেছে, তা নয়। এরা কি করে নিয়ন্ত্রিত থাকে ? আসলে মানুষের ওপর জনসংখ্যা নিযন্ত্রণের ভার বা দায়িত্ব নেই-ই। একটি মানুষ জন্মাতে নয় দশ মাস সময় লাগে, কিন্তু মৃত্যু এক পলকে হয়। প্রাকৃতিক প্রকোপে হাজার হাজার মানুষ এক সঙ্গে মরে যায়। মানুষ কৃত্রিম উপায়ে সন্তান-জন্ম-রোধ করলে এই অবস্থায় মানুষের জন্ম তো রোধ করা যাবে, কিন্তু মৃত্যু রোধ করবে কী ভাবে ? মৃত্যুতো বরাবরের মতো সবসময়

---

* ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।। (গীতা, ৯/১০)

'প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় সমস্ত জগৎ চরাচর সৃষ্টি করে। হে কৌন্তেয় ! সেই জন্যই জগৎ বিবিধ প্রকারে পরিবর্তিত হয়।'

নিজের কাজ করে যাবে। তাহলে এর ফল কী হবে? কোন এক গ্রামের এক সত্য ঘটনা। এক ব্যক্তির দুটি পুত্র ছিল। তিনি জন্মরোধের জন্য অপারেশান করিয়ে নেন। পরে একটি পুত্র মারা যায়। কিছুকাল পরে অপর পুত্রটিও মারা যায়। তখন বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা করার আর কেউ রইল না! আমি একবার দক্ষিণে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি দম্পতি আমাকে এসে বলে যে, তাদের দুটি পুত্র ছিল, তারপর তারা অপারেশান করিয়ে নেয়। একটি ছেলেকে পাগল কুকুর কামড়ানোর ফলে তার মৃত্যু হয়। এখন একটিই পুত্র আছে। 'আপনি আশীর্বাদ করুণ সে যেন বেঁচে থাকে।' আমি উত্তর দিলাম, আপনার ঘরে সন্তান উৎপাদনের খনি ছিল। তা আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন। আর এখন আমার আশীর্বাদ চাইছেন! আমি আশীর্বাদ দেবার যোগ্য বলে মনে করি না।

কিছু লোকে বলে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতেই পাপ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। তা একেবারে ভুল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে পাপ বাড়ে না, বরং মানুষের মধ্যে ধার্মিক ভাব এবং আস্তিক্যবোধ না থাকলে এবং ভোগেচ্ছায় পাপ বৃদ্ধি পায়, সরকারই যার জন্য দায়ী। লোককে এমন শিক্ষাই দেওয়া হয়, যাতে তাদের ধর্ম এবং ঈশ্বর থেকে বিশ্বাস চলে যায় ও ভোগেচ্ছা বাড়ে। এই জন্যই বিভিন্ন ধরনের পাপ কার্য বেড়ে যায়। এইরূপ বেকারী গরিবী ইত্যাদির কারণও জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, তার কারণ হল মানুষের অকর্মণ্যতা, প্রমাদ, আলস্য, ভোগলালসা বেড়ে যাওয়া। মানুষের মধ্যে ভোগলালসা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ভোগী ব্যক্তিই পাপী, অকর্মণ্য, প্রমাদী ও আলস্যপরায়ণ হয়ে থাকে। সাধনকারী সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের খালি সময় থাকেই না।

কোনো দেশকে ধ্বংস করার দুটি উপায় হল—জন্ম হতে না দেওয়া এবং হত্যা করা। এখন মানুষের জন্ম-রোধ করা হচ্ছে এবং পশুদের হত্যা করা হচ্ছে। মনুষ্য বিনাশের নাম রাখা হয়েছে—পরিবার
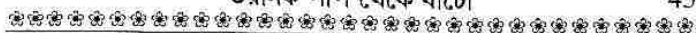
পরিকল্পনা আর পশুরহত্যার নাম রাখা হয়েছে—মাংস উৎপাদন ! বিনাশ কাল উপস্থিত হলে, মানুষের এইরূপ বিপরীত রাক্ষসী বুদ্ধিই হয়। মন্দোদরী রাবণকে বলেছিলেন—

নিকট কাল জেহি আওয়ত সাঈঁ। তেহি ভ্রম হোই তুম্হারিহি নাঈঁ।।

(মানস, লঙ্কাকাণ্ড ৩৭/৪)

আজকালকার মানুষ রাক্ষসের চেয়েও অধম হয়ে যাচ্ছে। রাক্ষসেরা তাও দেবতাদের পূজা করতো, তপস্যা করতো মন্ত্র-জপ করতো এবং তাঁদের থেকে শক্তি লাভ করতো। কিন্তু এখনকার মানুষদের বৃত্তি রাক্ষসদের (অপরকে নাশ করার) মত হলেও দেব-আরাধনা, তপস্যা, মন্ত্র-জপ ইত্যাদি মানে না, বরং সেগুলি ফালতু কাজ বলে মনে করে!

যে মায়ের সম্বন্ধে বলা হয়—'**মাত্রা সমং নাস্তি শরীরপোষম্**' অর্থাৎ 'মায়ের মত পালন পোষণকারী আর কেউ নেই', পরিবারপরিকল্পনার কার্যক্রমের প্রচারে সেই মায়েরও এতো পতন হয়েছে যে, তিনি তাঁর গর্ভস্থিত সন্তানকেও হত্যা করে থাকেন! একটি শাশুড়ী ও বউয়ের কথা আমি জানি। বউ, দুটি সন্তানের পর গর্ভপাত করাতে চেয়েছিল, কিন্তু শাশুড়ী বাধা দেওয়ায় তা করতে পারে নি। পরে তার একটি ছেলে জন্মায়। তার পরে চতুর্থবার গর্ভবতী হলে সে শাশুড়ীকে না বলে পিত্রালয়ে যায় এবং সেখানে গর্ভপাত করিয়ে অপারেশন করিয়ে নেয়। তৃতীয় ছেলেটি বড় হলে তাকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে দেয়। শাশুড়ী বারণ করেছিলেন যে, 'আমরা সাধারণ লোক, ইংরেজী স্কুলে অনেক খরচ আর ওখানে বাচ্চাদের রীতিনীতিও ভালো হয় না'। তাতে বউ রেগে গিয়ে শাশুড়ীকে বলে; 'এই ঝামেলা আপনার জন্যই তৈরী হয়েছে। আপনিই তো গর্ভপাত করাতে দেননি'। আজকাল মায়েদের এই দুর্দশা হয়েছে যে নিজ সন্তানও সহ্য হয় না। শাশুড়ী ভীষণ পাপ থেকে রক্ষা করলেন, আর বউ তাঁকে
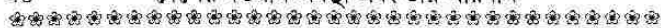
গঞ্জনা দেয়। অন্তরে পাপের প্রতি কি শ্রদ্ধা!

মানুষের নিজের সীমা এবং মর্যাদার মধ্যে থাকা উচিত। যদি জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের কাজ মানুষ নিজের হতে নেয় তাহলে প্রকৃতি কুপিত হয়। যার ফল হয় অতি ভয়ঙ্কর! মানুষের শুধু নিজ কর্তব্য পালনের, অন্যের সেবা করার, ভগবানকে স্মরণ করার, ভোগাদি ত্যাগ করার ও সংযম করার দয়িত্ব থাকে। ভোগাদি ত্যাগ ও সংযম মানুষই করতে সক্ষম। সন্তান না চাইলে, সংযম রাখা উচিত। হাল চালাবে অথচ বীজ বপন করবে না—এ কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পশুও স্বতঃই মর্যাদায় ও সংযমে থাকে; যেমন—গাধা শ্রাবণ মাসে, কুকুর কার্তিক মাসে, বেড়াল মাঘমাসেই ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করে, বাকী সময়ে তার সংয়ত থাকে। মানুষ যদি ইচ্ছা করে তাহলে তারা সর্বদা সংযত থাকতে পারে। সৎসঙ্গী একজন বোনের দুটি সন্তান আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, 'তুমি কৃত্রিম-উপায়ে সন্তান নিরোধ করনি তো?' সে বলল, 'আপনি যখন নিষেধ করেছেন, তখন আমি কি একাজ করতে পারি? আপনি সংযমের কথা বলেন, তাই আমরা সংযমে থাকি।' এই রূপ না জানি আরও কত নারী-পুরুষ সংযমে থাকেন! সংযম রাখলে শারীরিক, পারমার্থিক সর্বপ্রকারে উন্নতি হয়। অসংযম থেকেই রোগের উৎপত্তি। সংযম করলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, এবং আয়ু বেড়ে যায়।

আমাদের দেশে সংযমই সর্বদা প্রধান্য পেয়েছে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমেই কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের বিধান আছে। কিন্তু সংযমের প্রাধান্য চারটি আশ্রমেই বিদ্যমান। কিন্তু আজকাল সরকার এই আশ্রম ব্যবস্থা মানে না, সাধুদের অপমান করে, সৎসঙ্গ, সদাচার সংযমের প্রসারে অপরাগ এবং কৃত্রিমভাবে সন্তান-জন্ম-রোধের উপায়ের সাহায্যে লোকেদের ভোগী, অসংযমী হওয়ার.প্ররোচনা দিয়ে থাকে।

শাসক পিতার ন্যায় আর পুত্র হল প্রজার ন্যায়। সরকারের কাজ হল নিজের দেশের নাগরিকদের পাপ থেকে রক্ষা করে কর্তব্যপালনে, ধর্ম-পালনে ব্যাপৃত করা। কিন্তু এখন সরকার উলটে লোকেদের পাপ কাজে ব্যাপৃত করছে, বিভিন্ন প্রচার ও প্রসারের দ্বারা তাদের গর্ভপাত, মাংসাশী ডিম-ভক্ষণ ইত্যাদি পাপের প্ররোচনা দিচ্ছে! তাদের ভয় এবং প্রলোভন দেখিয়ে গর্ভপাত, অপারেশান ইত্যাদি পাপ করতে বাধ্য করছে। গর্ভপাত, অপারেশানের এতগুলি কেস আনলে পুরস্কার দেওয়া হবে, তা না হলে চাকরী থেকে বহিষ্কার করা হবে, মাইনে কাটা হবে অর্থাৎ পাপ করলে পুরস্কার পাবে, না করলে শাস্তি পাবে—সরকারের একি অন্যায় নীতি! শুধু তাই নয়, সরকার এই পাপেও সন্তুষ্ট না হয়ে গর্ভপাত ও জন্ম-রোধের আরও নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করছে, পশুহত্যা করার জন্যে নতুন নতুন কসাই খানা খুলছে। রামায়ণে আছে—

ঈস ভজনু সারথী সুজানা। বিরতি চর্ম সন্তোষ কৃপানা।।

(মানস, লঙ্কাকাণ্ড, ৮০/৪)

কৃপাণের তিন দিকে ধার হয়—বাঁদিকে, ডানদিকে এবং সামনে। তাই কৃপাণ তিন দিক দিয়ে শত্রুদের নাশ করে। সন্তোষকে কৃপাণ বলার অর্থ হল যে এটি কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিন শত্রুকেই নাশ করে দেয়*। সরকার সন্তোষ না করে কাম, ক্রোধ লোভ —তিনটি শত্রুরই বৃদ্ধি সাধন করছে, তবে দেশে সুখ শান্তি কীভাবে হবে?

❖ ❖ ❖

---

* বিনু সন্তোষ ন কাম নসাহীঁ। কাম অছত সুখ সপনেহুঁ নাহীঁ।।

(মানস, উত্তরকাণ্ড, ৯০/১)

নহি সন্তোষ ত পুনি কছু কহহূ। জনি রিস রোকি দুসহ দুখ সহহূ।।

(মানস, বালকাণ্ড, ২৭৪/৪)

উদিত অগস্তি পন্থি জল সোষা। জিমি লোভহি সোষই সন্তোষা।।

(মানস, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৬/২)

৪. গর্ভপাত কেন মহাপাপ?

যে-পাপগুলি হয়, সেগুলি কারো মানা বা না মানার ওপর নির্ভর করে না। পাপের ব্যাপারে অর্থাৎ অমুক কাজ পাপ—এতে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, শাস্ত্র এবং অনুভবকারী তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষদের বচনই প্রমাণ। গর্ভ নষ্ট করা, গর্ভপাত বা ভ্রূণহত্যা হিন্দুধর্মের, ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বতোভাবে বিরুদ্ধ কাজ। জগতের কোন শ্রেষ্ঠ ধর্মই এই পাপকে সমর্থন করে না এবং করতেও পারে না। কারণ এই কাজ মনুষ্যতার বিরুদ্ধ। ক্রূর ও হিংস্রপশুও এই কাজ করে না।

পৃথিবীতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। জগতে যত প্রাণী আছে, তাদের সকলের রক্ষা, সেবা, পালন-পোষণ করার অধিকার, যোগ্যতা, সামর্থ, সামগ্রী এবং দয়া মানুষের মধ্যেই থাকে। সেই মানুষকে হত্যা করা সবথেকে বড় পাপ। মানুষের মধ্যেও শিশুহত্যা করা সবচেয়ে বড় পাপ; কারণ শিশু নিরপরাধ, নির্বল এবং নিষ্পাপ হয়। আর যে-শিশু এখনও জন্মায়নি, গর্ভেই আছে, তাকে হত্যা কি ভয়ানক পাপ!

জীব গর্ভাবস্থায় নির্বল ও অসহায় অবস্থায় থাকে। সে নিজেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাও করতে পারে না বা কোন প্রতিকারও করতে পারে না। সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডাকতে পারে না, কাঁদতে পারে না, চেঁচাতেও পারে না। তার কোনও অপরাধ নেই। সে সর্বতোভাবে নির্দোষ। এই অবস্থায় সেই নিরপরাধ, নির্দোষ শিশু- হত্যা করা কত বড় মহাপাপ!

শত্রুতার জন্যে যে-যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাতে শত্রুবধেরই উদ্দেশ্য থাকে, তবুও সেক্ষেত্রে নিরস্ত্র সৈনিকের ওপর অস্ত্রাঘাত করা হয় না। প্রথমে শত্রুকে সাবধান করে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে, তবেই অস্ত্র চালায়। কিন্তু গর্ভস্থ শিশু তো সদা অসহায়। সে তো জানেই না যে কেউ তাকে হত্যা করছে! এই অবস্থায় সেই মূক প্রাণীকে ভয়ঙ্করভাবে হত্যা করা কি মহাপাপ, কি ভয়ঙ্কর অন্যায়?

একটি প্রবাদ আছে যে, বিষবৃক্ষ নিজে লাগালেও তাকে কাটা যায় না—**'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্'**। নারীপুরুষ মিলিত ভাবে যে-গর্ভ উৎপাদন করে তাকে নিজেরাই হত্যা করা কি মহাপাপ! অন্যায় (অসংযম) নিজেরাই করে কিন্তু হত্যা করে গর্ভের নিষ্পাপ সন্তানকে, এ কত বড়ো অন্যায়! যে-মাতা পিতার তাদের সন্তানদের স্নেহপূর্বক পালন-পোষণ ও রক্ষা করার কথা, তারাই যদি গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করে তাহলে কার কাছ থেকে রক্ষা পাবার আশা করা হবে *? সন্তানের কাছে মা-বাবা ঈশ্বরের সমান—**'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'**। যদি এঁরা নিজের সন্তানকে জন্মের আগেই হত্যা করে তবে রক্ষা করবে কে?

সাধুরা বর্ষার চারমাস একই স্থানে এই জন্য থাকেন যে, যাত্রার সময় তাঁদের পায়ের চাপে গাছ-পালার ছোট ছোট চারা না নষ্ট হয়ে যায়। ছোট ছোট গাছপালা বা অঙ্কুর প্রভৃতি স্থাবর প্রাণীর ক্ষেত্রেও যেখানে এত বিচার করা হয় তাহলে জঙ্গম প্রাণীর হিংসা করা কত বড় পাপ? জঙ্গম প্রাণীর মধ্যেও মানুষ সবথেকে শ্রেষ্ঠ। সেই মানুষকে গর্ভেই হত্যা করা কী মহাপাপ! এরথেকে বেশী আর কোন পাপ হয় না।

গর্ভস্থ সন্তান জন্মেরপরে কত ভালো ভালো লৌকিক ও পারমার্থিক কাজ করে, সমাজ ও দেশের সেবা করে, বহু লোককে সাহায্য করে, ক্ষেতে-খামারে কাজ করে অন্ন উৎপাদন করে, কল-কারখানা খোলে, সাধু

---

* সমর্থং বাসমর্থং বা কৃশং বাপ্যকৃশং তথা।
রক্ষত্যেব সুতং মাতা নান্যঃ পোষ্টা বিধানতঃ।। (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২২৬/২৯)

'পুত্র অসমর্থ হোক বা সমর্থ, দুর্বল হোক বা হৃষ্ট-পুষ্ট, মা তাকে রক্ষা করেন। মাতা ব্যতীত অন্য কেউ ঠিকমতো পুত্রের পালন-পোষণ করতে সক্ষম হয় না।'

নাস্তি মাতৃসমা ছায়া নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ।
নাস্তি মাতৃসমং ত্রাণং নাস্তি মাতৃসমা প্রিয়া।। (মহা, শান্তিপর্ব, ২২৬/৩১)

'বাচ্চার পক্ষে মাতার ন্যায় অন্য কোন ছায়া নেই অর্থাৎ মায়ের ছত্রছায়ায় যে সুখ., তা আর কোথাও নেই, মাতার ন্যায় আর কোন আশ্রয় নেই, মাতার তুল্য অন্য কোন রক্ষাকর্তা নেই এবং মাতার মত আর কোন প্রিয় বস্তু নেই।'

সন্ন্যাসী হয়ে কত লোককে সঠিক পথে আনয়ন করে, নিজের ও আরো অনেকের কল্যাণ করে। কিন্তু জন্মের আগেই তাদের হত্যা করা কি মহাপাপ! আমরা কি আগে থেকেই জানি যে গর্ভে কে আছে? সে কেমন হবে? যদি মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, স্বামী বিবেকানন্দ, এঁদের জন্মের আগেই গর্ভনষ্ট করে দেওয়া হোত, তাহলে দেশের কত না ক্ষতি হোত?

যাকে বাঁচাতে পারি না তাকে মারব কোন অধিকারে? জীবমাত্রেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাকে গর্ভেই নষ্ট করে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া মহা-পাপ। মানুষের অপরের সেবা করার, তাকে সুখী করার অধিকার আছে, কাউকে হত্যা করার কোনও অধিকার নেই। যদি এই গর্ভপাত প্রথা অবাধ গতিতে চালু হয় তবে মানুষ রাক্ষসেরও অধম হয়ে যাবে! রাবণ ও হিরণ্যকশিপু নামক রাক্ষসদের রাজত্বেও গর্ভপাতের মত মহাপাপ হয়নি।

শাস্ত্রে নানাস্থানে গর্ভপাতকে মহাপাপ বলে মানা হয়েছে। পারাশর স্মৃতিতে এটিকে ব্রহ্মহত্যারূপী মহাপাপেরও দ্বিগুণ বলা হয়েছে ঃ

যৎপাপং ব্রহ্মহত্যায়া দ্বিগুণং গর্ভপাতনে।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি তস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে।।

(৪/২০)

'ব্রহ্মহত্যায় যে পাপ হয়, তার দ্বিগুণ পাপ হয় গর্ভপাত করলে। গর্ভপাতরূপ এই মহাপাপের কোন প্রয়াশ্চিত্তও নেই, এতে সেই স্ত্রীলোককে ত্যাগ করে দেওয়ারই বিধান।'

খাদ্যের ওপর যদি গর্ভপাতকারী পাপীর দৃষ্টি পড়ে তাহলে সেই খাদ্য অভক্ষ্য (খাদ্যের অযোগ্য) হয়ে যায়—

ভ্রূণঘ্নাবেক্ষিতং চৈব সংস্পৃষ্টং চাপ্যুদক্যয়া।
পতত্রিণাবলীঢ়ং চ শুনা সংস্পৃষ্টমেব চ।।

(মনুস্মৃতি, ৪/২০৮)

'গর্ভনাশকারীর দ্বারা দৃষ্টিপাত করা, রজস্বলা স্ত্রীর স্পর্শ করা, পক্ষীর দ্বারা ভক্ষিত এবং কুকুর স্পর্শ-করা খাদ্য ভোজন করবে না।' মনুষ্য-দেহকে অত্যন্ত দুর্লভ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

বড়ে ভাগ মানুষ তনু পাবা। সুর দুর্লভ সব গ্রন্থন্হি গাবা।।

(মানস, উত্তরকাণ্ড, ৪৩/৪)

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১/২/২৯)

পরম কৃপালু ভগবান বিশেষ কৃপা করে জীবকে মনুষ্য-দেহ প্রদান করেন—

কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী।।

(মানস, উত্তরকাণ্ড, ৪৪/৩)

জীব মনুষ্য দেহ লাভ করে নিজের এবং অন্যেরও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। সে সকলের সেবা করতে পারে, এমনকি ভগবানের সেবাও করতে পারে! কিন্তু নিজে ভোগেচ্ছায় বশীভূত হয়ে সেই জীবকে এই দুর্লভ সুযোগ না দেওয়া, তাকে মনুষ্য-দেহ ধারণ করতে না দেওয়া, তাকে জন্মাতে না দেওয়া, জন্মাবার আগেই তাকে হত্যা করা, কি মহাপাপ! জীবের সঙ্গে একি ঘোর অন্যায়!

এরূপ মহাপাপীদের ভীষণ নরক এবং নীচ যোনিতে ভয়ঙ্কর কষ্ট পেতে হবে। কখনো মনুষ্যজন্ম হলেও তাদের আর সন্তান হবে না। সন্তানের জন্য তাদের কাঁদতে হবে! ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (প্রকৃতি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ে) কথিত আছে যে মূল প্রকৃতি তার গর্ভকে ব্রহ্মাণ্ড গোলকের জলে ফেলে দেওয়ায় সেই প্রকৃতিপ্রকটিত হওয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধা এবং রাধা থেকে প্রকটিত হওয়া গোপীদের কারোরই কোন সন্তান হয় নি।

জিজ্ঞাসা—গর্ভপাত করলে যদি পরজন্মে সন্তান না হয়, তবে তো অভীষ্ট-সিদ্ধই হয়, অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়বে না, তাহলে সন্তান না হলে

ক্ষতি কী?

উত্তর—সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হলে কী অবস্থা হয়, তা সেইসব গৃহস্থরাই অনুভব করেন, যাদের কোন সন্তান হয়নি। মানুষের মধ্যে তিনটি এষণা (ইচ্ছা) থাকে—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা। যাদের সন্তান হয় না তারা সন্তানের জন্যে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়, ডাক্তারের কাছে যায়, সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যায়, তীর্থে তীর্থে ঘোরে, ঔষধ খায়, মন্ত্র-জপ করে, দেব-দেবীর কাছে মানত করে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, ইত্যাদি।

রাজা দিলীপের কোন সন্তান ছিল না, তাই রাজা-রানী দিন-রাত বশিষ্ঠের গাভীকে মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করতেন। গাভীর বরে তাঁদের পুত্রলাভ হয়। সেই পুত্র 'রঘু' থেকেই রঘুবংশের উৎপত্তি। রাজা দশরথও পুত্র না হওয়ায় অত্যন্ত দঃখী ছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান—

একবার ভূপতি মন মাহীঁ। ভৈ গলানি মোরেঁ সুত নাহীঁ।।
সৃগী রিষিহি বসিষ্ঠ বোলাবা। পুত্রকাম সুভ জগ্য করাবা।।

(মানস, বালকাণ্ড, ১৮৯/১,৩)

কারণ সন্তান না হলে বাবার চিন্তা হয় যে আমার বংশরক্ষা হবে কীভাবে? আমার ধন-সম্পত্তি, জমি-জায়গার মালিক কে হবে? আমাদের অসুখ হলে বা বৃদ্ধ হলে দেখাশোনা, সেবা কে করবে? আমাদের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কে করবে, ইত্যাদি।

শিশুদের দেখতে, তাদের খাওয়া-পরাতে,তাদের নিয়ে খেলাধূলা করতে বড়ো আনন্দ পাওয়া যায়। নিজের শিশু তো বটেই, কুকুর, গাধা ইত্যাদিরও নবজাত বাচ্চা দেখলেও এক ধরনের আনন্দ হয়, তাকে আদর করতে হচ্ছা হয়।

এমনও দেখা যায় যে গৃহে বড় ছেলে-বৌয়ের যদি সন্তান না হয় তখন তারা ছোট ভাই-বৌয়ের শিশু-সন্তানদের দেখলে মনে মনে খুব কষ্ট

পায় যে, আমি বড় আর আমার কোন সন্তান নেই; আমার সন্তান থাকলে আমি তার বিয়ে দিতাম, বউ আনতাম, সে আমার সেবা করত! ছেলের সন্তান—নাতি, সে তো ছেলের চেয়েও প্রিয় হয়। প্রবাদ আছে আসলের চেয়ে সুদ বেশী মিষ্টি। এইরূপ সন্তান থাকার যে সুখ, তা গর্ভাপাতকারীরা জন্মান্তরেও পাবে না। কারণ গর্ভাপাতকারীদের পরজন্মেও সন্তান হয় না।

একটি সিদ্ধান্ত এই যে যারা যে বস্তুর সৎ ব্যবহার করে না, সে সেই বস্তু আর পায় না। মা শিশুকে মিষ্টি দিলে, সে যদি সেটি না খেয়ে নর্দমায় ফেলে দেয়, তাহলে মা তাকে আর মিষ্টি না দিয়ে একটি চড় লাগিয়ে দেন। তেমনই ভগবান কৃপা করে মনুষ্য-জন্ম প্রদান করেন, কিন্তু মানুষ যদি সেই শরীরকে কুভাবে ব্যবহার করে, পাপ করে, তখন ভগবান তাকে পুনর্বার মনুষ্য জন্ম না দিয়ে নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করেন। শিশুরা অবুঝ হয়, তাই মা তাকে পরে আবার মিষ্টি দেন, কিন্তু মানুষ জেনে বুঝে পাপ করে; তাই ভগবান তাকে পুনরায় মনুষ-দেহ প্রদান করেন না। এই ভাবে যে-ব্যক্তি অন্ন-জল নিরর্থক ভাবে নষ্ট করে, তাকে খিদে-তেষ্টায় কষ্ট পেতে হয়। যে-মালিক তার অনুগত ভৃত্যকে তিরস্কার করে, তখন সে আর পরে ভালো কাজের লোক পায় না। যে-ভৃত্য তার ভালো মালিকের নিন্দা করে, সে আর ভালো মালিক পায় না। যে-ভালো সাধুর নিন্দা করে অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকে ভাল শিক্ষা গ্রহণ করে না, সে আর ভালো সাধু পায় না। তেমনই যে গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করে, সে মনুষ্যজন্মে সন্তান পায় না। গর্ভপাত সবথেকে ভয়ঙ্কর অপরাধ; কারণ সন্তান কামনা না করে ভোগবিলাস করা— 'হতং মৈথুনমপ্রজম্' এবং অন্যটি হল তার থেকে উৎপন্ন গর্ভ নষ্ট করা। নাশের পরিণাম বিনাশ। তাই ভাবী ভীষণ যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে বুদ্ধিমান নারী-পুরুষের কখনো গর্ভপাত-রূপ মহাপাপ করা উচিত নয়।

❖ ❖ ❖

৫. সংঘর্ষের কারণ

আজকাল প্রচার করা হচ্ছে যে জাতিভেদের জন্যেই সমাজে সংঘর্ষ হচ্ছে; তাই জাতিভেদ মানা উচিত নয়। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এই সব সংঘর্ষ জাতিভেদের জন্যে হয় না, এর উৎপত্তি অহঙ্কার-উদ্ভূত স্বার্থ এবং অহং অভিমান থেকে।

সৃষ্টিতে জাতিভেদ স্বাভাবিক ব্যাপার। বিভিন্ন দেশে মানুষের নানা জাতি বিদ্যমান। শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদিতেও জাতিভেদ স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া. উট, কুকুর ইত্যাদিতে নানা জাতি আছে এবং তাদেরও এক এক জাতিতে অনেক ভাগ আছে। জাতির থেকেই তাদের নানা গুণাবলী জানা যায়। যারা এগুলি ক্রয়-বিক্রয় করে তারা এগুলির জাতি-বিভাগের সঙ্গে ভালোমত পরিচিত। জাতি দেখেই এরা দাম নির্ধারণ করে। এই রূপ গাছেরও নানা জাতি হয়। ফল ও সব্জীর এবং আনাজেরও নানা জাতি হয়। এই জাতিভেদের কারণ এই সৃষ্টি বিষম এবং এতে এক সমান দেখালেও দুটি বস্তু তখনও সমান হয় না। তাই জাতির জন্য শত্রুতা হয় না। স্বার্থ এবং অহং -অভিমানের জন্যই শত্রুতার সৃষ্টি হয়, যা আসুরী সম্পদ।

একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বা শত্রুতা হয় না, বরং একই জাতির মধ্যে পরস্পর স্বার্থ এবং অভিমান নিয়ে শত্রুতা হয়, যেমন পুরুষ-জাতির সঙ্গে পুরুষ-জাতির, নারী জাতির সঙ্গে নারী জাতির। পশুদের মধ্যেও পুরুষ পশুর সঙ্গে পুরুষ পশুর এবং স্ত্রী পশুর সঙ্গে স্ত্রী পশুর লড়াই হয়। যেমন (পু) কুকুরে-কুকুরে এবং (পু) বাঁদরে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়, অন্যেরা এই লড়াইয়ে নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকে। একপাল স্ত্রী বাঁদরের মধ্যে একটি সর্দার পুরুষ-বাঁদর থাকে। সেই পালে কোন পুরুষ-বাঁদর জন্মালে সে সেটিকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং মেরে ফেলে, কেননা এতে তার সুখভোগে বাধা পড়বে। কিন্তু স্ত্রী-বাঁদর তাকে হত্যা করে না। কুকুরের মধ্যেও এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। পুরুষ-বাচ্চা হলে, (পু) কুকুর ওটিকে মেরে ফেলে এবং মাদি-বাচ্চা হলে

স্ত্রী-কুকুরটি ওটিকে নষ্ট করে।।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বা শত্রুতা হয় না। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণের সঙ্গে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে, বৈশ্যের বৈশ্যের সঙ্গে এবং শূদ্রের শূদ্রের সঙ্গে শত্রুতা হয়। তাৎপর্য হল যেখানে এক জীবিকা সেখানেই স্বার্থবশত যুদ্ধ হয়। যদি সব কাজেই সকলের অধিকার বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এতে সংঘর্ষ খুবই বেড়ে যায়। কারণ এরূপ মানলে, যে জীবিকায় বেশী অর্থ এবং মান-সম্মান পাওয়া যায়, সকলেই তা করতে চাইবে এবং যে-জীবিকাতে অর্থ-মান-মর্যাদা কম, তা কেউ করবে না। উচ্চ কাজ সবাই করতে চাইবে, কিন্তু নীচু কাজ কেউ করবে না। যেমন আগে রাজত্বের জন্যে কেবল রাজপুতেরাই যুদ্ধ করত, কিন্তু এখন সকলেই মারামারী করে। আগে চার বর্ণ নিজ নিজ বর্ণ অনুসারে কাজ করত, কিন্তু এখন চার বর্ণের সব কাজেই সকলের অধিকার হওয়ায় সংঘর্ষ কমপক্ষে ষোলোগুণ বেড়ে গেছে! আগে লোকে নিজ নিজ বর্ণ-অশ্রমের মর্যাদানুসারে চলত এবং সুখ-শান্তিতে থাকত। কিন্তু এখন বর্ণাশ্রমের মর্যাদা দূর করে স্বার্থবশত অনেক পার্টি তৈরী করা হচ্ছে, এবং রাজ্যলোভে নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। ভিন্ন সম্প্রদায়কারীদের ভোটের লোভে হিন্দু হিন্দুদেরই ধ্বংস করছে। মা-বাপ-ছেলে—তিনজনই পৃথক পার্টিকে ভোট দেয় আর ঘরে ঝগড়া করে। প্রচার করা হয় যে সকলের মধ্যে একতা থাকা উচিত, কিন্তু আসলে এক একই হচ্ছে, অর্থাৎ মা এক, বাবা এক, সন্তান আর এক, সব আলাদা আলাদা। কারণ, বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল মর্যাদা ও কর্তব্য নিয়েই, আর পার্টির সৃষ্টি হয় স্বার্থ নিয়ে।

স্বার্থ এবং অভিমানের জন্যেই বিভিন্ন বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় ইত্যাদির মানুষের মধ্যে নিজ বর্ণ ইত্যাদির পক্ষপাত থাকে, যাতে তারা নিজ বর্ণ প্রভৃতিকে সমর্থন এবং অপর বর্ণগুলির বিরোধিতা করে থাকে। এই বিষয়ে এক গল্প আছে—একটি বারবনিতা ছিল। তার চিন্তা হল যে, 'আমার কল্যাণ হবে কী করে?' নিজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে সে সাধুদের কাছে

গেল। তাঁরা বললেন, 'তুমি সাধুসঙ্গ করো। সাধুরা ত্যাগী হন, অতএব তাঁদের সেবা করলে তোমার কল্যাণ হবে।' তারপর ব্রাহ্মণদের কাছে গেল, তাঁরা বলল যে, ' সাধুরা ভেকধারী হয়, কিন্তু আমি জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ সকলের গুরু,' অতএব তুমি ব্রাহ্মণদের সেবা করলে তোমার কল্যাণ হবে।' তারপর সে সন্ন্যাসীদের কাছে গেল। তাঁরা বললেন, 'সন্ন্যাসীরা সকল বর্ণেরই গুরু, তাই তাঁদের সেবা করলেই কল্যাণ হবে।' তারপর সে গেল বৈরাগীদের কাছে, তারা বললেন, 'বৈরাগীরা সব থেকে তেজস্বী; তাই তাদের সেবা করলে তোমার কল্যাণ হবে।' তারপর সে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের গুরুদের কাছে গেল, তারা সকলেই বলল যে, 'আমিই সব থেকে শ্রেষ্ঠ, বাকী সব পাষণ্ড। তুমি আমার চেলা হও, আমার কাছে মন্ত্র নাও, তাহলে আমি সব বলব, যাতে তোমার কল্যাণ হয়!' এইভাবে সেই বারবনিতা যেখানেই গেল, সেখানেই তাকে নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম, মত, সম্প্রাদায় ইত্যাদির পক্ষপাত দেখাল। এইসব দেখে তার মনে হল ঃ 'এখন সব তত্ত্ব বুঝলাম! যুক্তিগুলি বুঝলাম! সাধুরা বলেন, তাদের পূজা করো, ব্রাহ্মণেরা বলেন, তাদের পূজা কর, আমি কেন বেশ্যাদের পূজা করব না!' এই ভেবে সে বারবনিতাদের খাওয়াতে মনস্থ করল এবং তাদের নিমন্ত্রণ করল। ঠিক সময়ে বারবনিতারা আসতে থাকলো।

সেই গ্রামের বাইরে একজন সংসার বিরক্ত, ত্যাগী সন্ত থাকতেন। তিনি এইসব দেখে ভাবতে থাকলেন, 'আজ কি ব্যাপার?' যখন তিনি বুঝলেন যে আজ বারবনিতাদের ভোজ হচ্ছে তখন তিনি সেই বারবনিতাকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্যে সেখানে গেলেন। রান্না তৈরী হচ্ছিল। রন্ধনকারী ভাতের ফেন নর্দমায় ফেলছিল। বারবনিতা ছাদ থেকে যেদিকে তাকিয়েছিল বাবাজী সেদিকে বসে ফেনে হাতধুতে লাগলেন। বারবনিতা দেখে বলল, 'বাবাজী, কি করছেন?' বাবাজী বললেন, ' তুমি কি অন্ধ নাকি? দেখতে পাচ্ছ না যে আমি হাত ধুচ্ছি?' বারবনিতা বারণ করলেও

বাবাজী তা গ্রাহ্য করলেন না। বারবনিতা নীচে নেমে এসে বলল, 'বাবাজী এ তো ফেন, এতে হাত ধুলে আরও নোংরা হবে! আপনি পরিষ্কার জলে হাত ধোন।' বাবাজী বললেন, 'এতে যদি হাত নোংরা হয়, তাহলে বারবনিতারা কি বেশী পরিচ্ছন্ন, নির্মল, যাতে তাদের সেবায়, কল্যাণ হবে? হাত অপরিষ্কার জলে পরিষ্কার হয়, না পরিষ্কার জলে হয়? তাই শুনে বারবনিতার খেয়াল হোল যে, বাবাজী তো ঠিকই বলছেন! তাহলে কল্যাণ কিসে হবে? তখন বাবাজী বললেন—'যে-সাধুর মধ্যে কোন মত, সম্প্রদায় ইত্যাদির প্রতি পক্ষপাত, আগ্রহ না থাকে, যাঁর আচরণ শুদ্ধ, যাঁর মধ্যে একমাত্র এইভাব থাকে যে জীবের কল্যাণ হবে কী-ভাবে, যাঁর মনে কোন প্রকার কামনা নেই—সেই সাধু স্ত্রী হোন বা পুরুষ, সাধু হোন বা ব্রাহ্মণ, যে কোন বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়ের হোন না কেন, সেই সাধুর সঙ্গ করো, তাঁর কথা যদি শোনো তাহলে তোমার নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে।'

তাৎপর্য হলো এই যে, যেখানে স্বার্থ এবং অভিমান থাকবে, ভোগ-বাসনা এবং সম্পদ-সংগ্রহের ইচ্ছা থাকবে, সেখানে আসুরী-সম্পদ আসবেই। যেখানে আসুরী সম্পদ থাকবে, সেখানে কখনও শান্তি থাকবে না। অশান্তি আসবে, সংঘর্ষ হবে এবং পতন হবে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।

(গীতা, ১৬/২১)

'কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিন প্রকার নরকের দ্বার জীবাত্মার পতনকারী, তাই এই তিনটি অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত।'